গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়

হিমালয় অঙ্গনে

গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়

HIMALAY ANGANEY
(A travelogue on the Himalayas)
by
Gopinath Mukhopadhyay

প্রথম প্রকাশ : ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ / ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯০

প্রকাশক :
অর্পিতা মুখার্জী
মৌমিতা প্রকাশন
কে. বি. এম. ৬২৫
চাকদহ, নদীয়া

'চল যাই' পত্রিকার উদ্যোগে প্রকাশিত

মুদ্রক :
শ্রীশান্তিময় ব্যানার্জী
প্রিন্টার্স কর্নার প্রাইভেট লিমিটেড
১ গঙ্গাধরবাবু লেন
কলকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ শিল্পী : বাদল দে

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি-৯

মূল্য : বাইশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : চিরঞ্জীব প্রকাশনী
৪২ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

পথনির্দেশক স্কেচ :

প্রথা না মেনে ঘুরে বেড়াই হিমালয়ের পথে পথে। কোথাও শোনা পথের দেখা পাই, কোথাও লোকালয়হীন পথে চলতে চলতে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়। হয়তো ভবিষ্যতে এ পথ এমন থাকবে না। সেদিন কেউ বা মনে করবেন—এ পথ এক সময় অমন ছিল। তাই নিজের অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কাহিনীগুলিতে যে সব ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা হয়েছে, তার অধিকাংশই কাল্পনিক। যদি কারও সঙ্গে মিলে যায়, তা নেহাতই কাকতালীয়।

এই বইয়ের বেশ কিছু লেখা 'চল যাই', 'ভাণ্ডার' প্রভৃতি পত্রিকায় সংক্ষেপে প্রকাশ পেয়েছিল। এবার তা বিস্তারিত হয়েছে। বলা যায়, কাঠামো ছাড়া আগের লেখার প্রায় কিছুই নেই।

'চল যাই' পত্রিকার পাঠকদের অনুপ্রেরণায় 'হিমালয় অঙ্গনে' প্রকাশ করা সম্ভব হলো। যাঁরা নেপথ্যে থেকে 'কেন লিখছিনা' অনুযোগ ক'রে শুধুই অপেক্ষা করেছেন, তাঁদের নাম অপ্রকাশিতই থাক। শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বইটি লিখতে বাধ্য করেছেন। তিনি বন্ধুর কাজ করেছেন কিনা সিদ্ধান্ত নেবেন পাঠকরাই।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯০
আর ই. ৬, ১৯৩ আন্দুল রোড
হাওড়া-৭১১১০৯

গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়

দেবালয় হিমালয়

রুদ্রপ্রয়াগে ছাড়িয়ে যাচ্ছি রুদ্রনাথের মন্দির। বাস হঠাৎ জোরে ব্রেক কষে থেমে গেল। যাত্রী উঠছে মাঝপথে। বাসের দরজা পিছনে। সব যাত্রীর চোখই ঘুরে গেছে পিছন দিকে। কিন্তু চোখ তাদের ফিরছে না কেন? তাকিয়ে দেখি, একটি মেয়ে উঠেছে। পাশে বসলে বেশ হয়। কিন্তু এতটা এগিয়ে আসবে কি? ভরসা কম। আমি বসেছি বাসের সামনের দিকে। আকর্ষণীয়া মেয়েকে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্য যে কোন বৃদ্ধও উন্মুখ। জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ভাবছি সে যেন আমারই পাশের খালি সিটে এসে বসেছে। উষ্ণতা অনুভব করছি। একটু পরশ।

খিলখিল হাসি শুনে তাকাতেই দেখি ডান দিকের সিটে বসা বৌদি ও সুরমাদি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আর সব যাত্রীর চোখ যেন বলতে চাইছে 'রাসকেল'। মনের চাওয়া পরশ যে বাস্তব হয়েছে বুঝতে পারি। জানালার দিকে আর একটু চেপে বসি। দূরত্ব কিন্তু থাকেনা। হাত কাঁধ মিলে গেছে। কী যেন জিজ্ঞেস করছে। বুঝতে পারি না। তাকিয়ে দেখি। বৌদিদের কথা ভেবে অবশ্যই আড়চোখে।

বিচিত্রা! ছিপছিপে নিটোল গড়নের শ্যামলী মেয়ে। সবুজ রঙের শাড়ি। প্রায় কনুই পর্যন্ত রুপো ও কাচের চুড়ির অলংকার। মুখশ্রীতে সরল ছটফটানি। নাকে পাতার নাকচাবি এবং কানে দুলছে পাতারই বিচিত্র সুন্দর ডিজাইনের দুল। সবুজ অলংকারে নিজেও যেন সবুজ

হয়েছে। সিঁথি থেকে কপাল পর্যন্ত ঝুলছে রুপোর টিক্‌লী। সবুজের ঘের থেকে প্রশান্ত মুখমণ্ডলের উপর রজত মুকুট মাথায় পর্বতেরই গাড়োয়ালী কন্যা পার্বতী। এই সাজই তো মানায়।

একটু ঠেলা দিয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করে আবার। এবারও ভাষা বুঝতে পারিনা। তাকিয়েই থাকি। এবার সরাসরি চোখে চোখ। চকিত হাসিতে চমকে উঠি। সামনের সিটে বসা লোকটি এবার ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটির হয়ে জিজ্ঞেস করে, "কাঁহাসে আতে ?"

—কৃষ্ণনগর। কলকাত্তাকা নজদিগ।

—সাথমে কৌন্‌ হ্যায় ?

—দোস্ত, পড়োশী আউর মুসাফিরলোগ।

—জেনানা নেহি হ্যায় ?

—জী, নেহি।

দৃষ্টি আবার তির্যক হয়। পার্শ্ববর্ত্তিনীর চাপা হাসির ঠোঁট ছুটি প্রায়-ফুটবে গোলাপ-কলির রূপ নিচ্ছে। মৃতুস্বর কানে আসে, "যাইয়েগা কাঁহা ?"

—কেদারনাথ, ত্রিযুগীনারায়ণ।

—"সাদী কে লিয়ে ?"দমকা বাতাসের মত কলহাস্য।

এবার সরাসরি মেয়েটির দিকে তাকাতে কোন বাধা নেই। সংকোচ যেখানে সেটাতো কেউ দেখতে পাবেনা। সেই মনটাই যে চোখকে দিয়ে দেখাচ্ছে পাশে চলা সবুজ, চড়াই-উৎরাই, ধ্বস ও খাদ।

গুপ্তকাশী পৌঁছবার আগেই বাস বাঁক নেবার মুখে ডানে দেখা যাচ্ছে উখীমঠের লাল মন্দির ও ধ্বজা। শীতকালে এখানেই পুজো হয় কেদারনাথের। দূর থেকে সুন্দর লাগছে দেখতে।

ঋষিকেশ থেকে ১৮৩ কিলোমিটার এসে বাস থামলো গুপ্তকাশী। এখানে রয়েছে অর্দ্ধনারীশ্বর ও বিশ্বনাথ মন্দির। উন্নত জনপদ। কিছুক্ষণের জন্য চা-পানের বিরতি।

মেয়েটি নেমে গেল।

সুরমাদির খুশীর ঠাট্টা, "পাশে ভাই বেশ মানিয়েছিল।"

আমি মুচকে হাসি। অমনি বৌদির সরব কণ্ঠ, "তোমার কপালে কচু পোড়েংগা।"

হরিদ্বার পৌঁছনর পর থেকেই দেখছি বৌদি হিন্দীতে কথা বলতে শুরু করেছেন। এই কদিনেই আমার কপালের রেখা পড়ে ফেলতেও অসুবিধে হয়নি।

"নমস্তে।" মেয়েটির সাথী ভদ্রলোক নামার আগে পাশে দাঁড়ায়। "কেদারে তো তোমাদের ঘোড়া লাগবে?"

—আগে তো যাই।

—ঘোড়াওয়ালাদের আমার নাম বলবে। ভাল ঘোড়া দেবে। রেটও একটু কম নেবে।

—ধন্যবাদ।

—"ফির মিলেঙ্গে" বলে মেয়েটিকে নিয়ে চলতে থাকে।

একটু নেমে চা খাওয়া যাক। দোকানে বসেছি। হাসিমুখে এগিয়ে আসে বাসে আলাপ ছেলেটি। অনুরোধ, "যাবেন আমাদের বাড়ি?"

—কোথায়?

—এখানেই। কিছুটা হেঁটে।

—কেদার যাব যে?

—দু'দিন আমাদের গ্রাম দেখেই যান না।

এবার তো হবে না। তবু মন ব্যাকুল হয় যাবার জন্য। শ্রীনগর থেকে ছেলেটি বাসে উঠেছে। আলাপ। শ্রীনগরে কৃষি-বিজ্ঞানের ছাত্র। শুনিয়েছে উন্নয়নমুখী গাড়োয়ালের কাহিনী। কেমন করে জমিতে ঝুম চাষ হয়। পাহাড়ের গহনে কিভাবে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। সরকার থেকে সাহায্য করে চাষের জন্য। জলসেচেরও ব্যবস্থা আছে। একটু সম্পদ যাদের আছে তারা ছেলেমেয়েদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছে। কলেজের সংখ্যা খুবই কম। পড়তে আসতে হয় শ্রীনগরে।

"পড়া শেষে কী করবে ? চাকরি ?" জানতে চাই।

—না। কৃষিকে আরও উন্নত করব। সেজন্যই তো পিতাজী পড়তে পাঠিয়েছেন।

মুগ্ধ হই। এবার ওদের বাড়ি না যেতে পারার অক্ষমতা জানাই।

—আবার এদিকে এলে যাবেন তো আমাদের বাড়ি ? থাকবেন কিছুদিন।

—দেখি। ইচ্ছে তো হয়।

—আসবেন কিন্তু। চলি। নমস্তে।

ছেলেটিও চলতে থাকে আপন পথে। গুপ্তকাশী যেন ক্ষণিক আত্মীয় বিয়োগ ঘটাচ্ছে। মনটা কেমন মুচড়ে ওঠে। পথিকের পথ চলাতেই আনন্দ। তবে কেন এই পিছন ফিরে চাওয়া ?

বাস আবার চলতে শুরু করেছে। বেশ ভীড় হয়েছে। মনটা আনমনা হয়ে গেছে। রাস্তার বাঁকে বাঁকে ডান দিকে চোখে পড়ছে পাহাড়ের বরফচূড়া। হঠাৎ ঘোর কেটে যায়। শুনি, "হেই হেই, দ্দুর দ্দুর, হঠাও।"

তাকিয়ে দেখি, এবার বাসে তিনটি ভেড়া যাত্রী। সারা গায়ে নোংরামাখা বৃদ্ধ মেষটির পশ্চাদ্দিক একদম নিমাইদার মুখের কাছে। তাই এই বিরক্তিকর উত্তেজনা।

নিমাইদা গজরাচ্ছেন, "বাসে কেউ গরু-ছাগল-ভেড়া নেয় ? ছিঃ ছিঃ। এরা কী মানুষ ?"

হাসি চেপে বলি, "দাদা, আপনার কী সৌভাগ্য ! এই ভেড়ারূপেই হয়তো দেখা দিলেন স্বয়ং কেদারনাথ। যেমন পাণ্ডবদের মহিষরূপে দিয়েছিলেন।"

কটমট করে তাকাতেই চুপ করে যাই। নিমাইদা তখনও গজরাচ্ছেন, "কী দুর্গন্ধরে বাবা।"

ভাবছি ফেলে আসা পথের কথা। ঋষিকেশ থেকে বাস যখন উপরে উঠতে আরম্ভ করলো, মনে বেশ চিন্তা ছিল। পাশে বয়ে যাওয়া

গঙ্গা ক্রমেই নিচে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। এক সময় একটি সরু ফিতের মতো। একপাশে পাহাড় খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। আর একপাশে খাদ ক্রমেই গভীরতর হচ্ছে। পথের বাঁকে বাঁকে হুঁশিয়ারী, "বাস ধীরে চালাও। মনে রেখ, তোমার শিশুটি তোমার ঘরে ফেরার পথ চেয়ে রয়েছে। সামনে বাঁক, সাবধান। এখানে হর্ণ বাজাও।" কিন্তু ড্রাইভার তার উপর কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে বুঝতে পারি না। সারা পথে ক'বার হর্ণ বাজিয়েছে গুনে বলা যায়।

ছেড়ে গেছি এক সময়ের প্রসিদ্ধ চটি ব্যাসী। ঋষিকেশ থেকে ৭২ কিলোমিটার পরে পার হয়েছি অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গমতীর্থ প্রাচীনতম তীর্থগুলির অন্যতম দেবপ্রিয় 'দেবপ্রয়াগ'। দুই নদীর দুই রঙ। পাশেই মন্দির। মন্দির থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে এসে মিশেছে নদীতে। ঘাটে পুণ্যার্থীরা পূজা দিচ্ছে। পিণ্ডদান করছে পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশে। পিণ্ডদানে পুণ্যফল গয়ার মতোই। আগে তীর্থ যাত্রীদের এখান থেকেই নিতে হতো পাণ্ডা বা গাইড। এরপর পথ ছিল অনিশ্চিত। কালের স্বাভাবিক নিয়মে সেই পথের দুর্গমতার অবসান হলো। যাত্রাপথের বাস দাঁড়ায় ক্ষণিকের জন্য। যাত্রীরা দেখে কৌতূহলভরে। নামার দরকার হয় না। পূজার উদ্দেশ্য ছাড়া নামেও না কেউ। পাণ্ডারা এখনও আছে। গাইডের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই অনেকে যাত্রীনিবাস খুলেছে কেদারে, বদ্রীনাথে। শীতকালে যখন মন্দির বন্ধ হয়ে যায়, নেমে আসে দেবপ্রয়াগে।

বাস এগিয়ে চলে। দেবপ্রয়াগ থেকে ৩২ কিলোমিটার পথ চলে এসেছি। সমতলের মতো ঘরবাড়ি। জমাট শহর। পৌড়ি গাড়োয়ালের শ্রীনগর। সৌন্দর্য্য বিচারে সার্থক নামকরণ। গঙ্গোত্রী থেকে কেদারনাথের বাসপথ টিহরী হয়ে এই শ্রীনগরেই এসে মিশেছে। স্কুল, কলেজ, সেনাবাহিনীর ছাউনী, হাসপাতাল, বাংলো, হোটেল, ধর্মশালা রাস্তার দু'পাশ ধরে পুরো শহরটিকেই সাজিয়ে দিয়েছে। বাস, লরি, মোটর গাড়ির ছড়াছড়ি। কে বলবে হিমালয়ের কোলে বসে চলেছি?

একটু আগে গুপ্তকাশীতে বিদায় নেওয়া ছেলেটি এখান থেকেই বাসে উঠেছিল। লাজুক অথচ বুদ্ধিমান ছেলেটি নানা কথায় বাসের এক-ঘেয়েমী দূর করেছিল। চলে গেছে। মনে রেখে গেছে আনন্দস্মৃতির বোঝা। কানে বাজছে তার অনুরোধ, "এদিকে আবার এলে যাবেন তো আমাদের বাড়ি? আসবেন কিন্তু।"

বাস পাক খেতে খেতে উঠেই চলেছে। যাত্রীদের অনেকেরই বমি হচ্ছে। বৌদিও ঘন ঘন বমি করছেন। ওষুধ দিতে চাই। কিন্তু নিমাইদার তাতে দারুণ আপত্তি। ওঁর ধারণা, হোমিওপ্যাথি ওষুধেই সেরে যাবে। বলি, "এখনকার মতো তো সামাল দিন; পরে আপনার ওষুধ খাওয়াবেন।"

—কিছু দরকার নেই। লজেন্স খেলেই সেরে যাবে।

—দুর্ব্বল হয়ে পড়লে হাঁটবে কি করে?

—বাসে অমন হয়। নামলেই দেখো, তোমার বৌদি দৌড়চ্ছে।

অবাক হই। কিন্তু কিছু করার নেই। যার উনি, তিনিই যদি না বোঝেন, আমাদের কী করার আছে।

রাস্তার দু'পাশ থেকে বাঁশ নামিয়ে বাস দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। চেকিং। শ্রীনগরের আগে তো একবার হয়েছে। পুলিশ দেখে নিয়েছে ব্যাগগুলি। কেউ মাদকদ্রব্য নিয়েছে কি না। গাড়োয়ালে মদ নিষিদ্ধ। এখানে আবার চেকিং কিসের? কণ্ডাক্টার জানায়, ইঞ্জেকশন সার্টিফি-কেট লাগবে। না হলে যেতে দেবে না।

"কী হলো তোমাদের?"—নিমাইদা বিরক্ত হয়ে জানতে চান।

"কলেরার ইঞ্জেকশন নিতে হবে।"—জানাই।

—ও আমার নেওয়া আছে। বলে দাও।

—কিন্তু সার্টিফিকেট তো নেই।

—নেই তো কি হয়েছে? ও আমি নেব না। যদি ফিরে যেতে হয়, যাব। ও আমি জীবনে নিই নি।

—কিন্তু নিমাইদার কোন যুক্তিই টিঁকলো না। অথচ উনিও

কিছুতেই ইঞ্জেকশন নেবেন না। এ এক বিষম সমস্যা। অতএব কিছু টাকা খরচ করতেই হলো পরচা নিতে। কানুন মানতেই হয়।

তারপর আরও ৩২ কিলোমিটার পথ পার হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগ এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে জিম কর্বেট ও মানুষখেকো চিতার রোমাঞ্চকর জীবন্ত স্মৃতি। এখান থেকে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ যাবার পথ আলাদা হয়ে গেছে। কেদারনাথের পথ চলেছে মন্দাকিনীকে অনুসরণ করে আর বদ্রীনাথের পথ অনুসরণ করেছে অলকানন্দাকে। এখানেই মিলেছে স্বর্গ ও মর্ত্তের নদী মন্দাকিনী ও অলকানন্দা।

এক সময়ের প্রসিদ্ধ চটি অগস্ত্যমুনীও পেরিয়ে এসেছি। কয়েকটি দোকান ও মন্দির দেখেছি বাসে বসেই। ওঠা-নামার যাত্রী না থাকলে এখন আর বাসও দাঁড়ায় না।

"হায় পিরীতি গরল ভেল।" চমকে উঠি। পাশে কখন বৌদি এসেছেন খেয়াল করিনি। তাকাই।

—এতই বিভোর ?

গুপ্তকাশীতে মেয়েটি নেমে যাবার পর থেকেই এরা একটু মজার স্বাদ পেয়েছে। কিছু বলতে চাই। তার আগেই বাস দাঁড়িয়ে গেছে। সোনপ্রয়াগ। অর্থাৎ গুপ্তকাশী থেকে আরও ২৯ কিলোমিটার চলে এসেছি। ড্রাইভার নামার সুযোগ দিল না। মনটা উতলা লাগছে। বন্ধুর আশ্বাস পেলাম, "কেদারনাথ থেকে ফেরার পথে এখানে নামব। এখান থেকে যাব ত্রিযুগীনারায়ণ।"

আরও পাঁচ কিলোমিটার এসে বাস থামলো। ঋষিকেশ থেকে ২১৫ কিলোমিটার এলাম। বিকেল সাড়ে চারটে। পৌঁছলাম গৌরীকুণ্ড। উচ্চতা ১৯৮১ মিটার। কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছিনা যে! হঠাৎ এই উচ্চতায় সবাই কি বধির হয়ে গেলাম ?

ছোট্ট জায়গায় বাস গুম্‌টি। এক পাশে গভীর অরণ্য। বিশাল চেহারার গাছেরা সব দাঁড়িয়ে আছে। যেন প্রতিযোগিতা, কে কত উঁচু হয়ে সূর্য্যের কাছে যেতে পারে। উপর থেকে মন্দাকিনী ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

ঠাণ্ডায় কাঁপুনি দিচ্ছে। বাসে ঠিক বুঝতে পারি নি শীতের প্রকৃত অবস্থাটা। মালপত্র নামানোর কিছু নেই। সবই তো রেখে এসেছি ঋষিকেশে কালীকম্‌লী ধর্মশালায়। বেশ ছমছমে ভাব।

দু'একজন এসে জেনে নিতে চাইছে আমরা কোথায় উঠব। এখানে মন্দির কমিটির অতিথিশালা আছে। আছে ইন্‌স্পেকসন বাংলো, ট্রাভেলার্স লজ, চটি, ধর্মশালা। কিছু টিনের চালার ঘরও ভাড়া পাওয়া যায়। পাকা ঘরও আছে। ছোট হোটেলের সংস্করণ। আমরা ভারত সেবাশ্রম সংঘের ধর্মশালায় উঠলাম। কাঠের দোতলা বাড়ি। পাশেই নেমে আসছে মন্দাকিনী। আর একপাশে প্রাচীন পার্বতী মন্দির ও উষ্ণকুণ্ডের পথ। নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত তো বটেই, ভালও লাগছে বেশ। সামান্য ভাড়ায় কম্বলও পাওয়া গেছে প্রয়োজনমত।

কিছু কেনাকাটার দরকার। সঙ্গে মোম আনা হয়নি। এখানকার বিজলী বাতির উপর কোনই ভরসা নেই। কাল হাঁটা পথের শুরু হবে। দোকান থেকে লাঠি নিতে হবে।

—"নিমাইদা, কিছু কিনবেন না?"—জিজ্ঞেস করি।

—কিনবই যখন, লাঠিটা একটু মজবুত দেখে নিই চল।

—কিনব না তো। ভাড়ায় নেব।

—তাহলে আর কেন যাব?

—মজবুত কি না দেখবেন না?

—ও তোমরাই দেখে নাও।

তাই তো। নিজের খরচ হলে পাকাপোক্ত পছন্দমতই নিতেন। বরাদ্দের জিনিষ যাচাই করে লাভ কি?

কিন্তু নিমাইদার কিছু কেনা যে বাকি আছে। তার কি হবে? ঋষিকেশেই দস্তানা, মোজা, টুপি সবার জন্য কিনে নিতে বলেছিলাম। রাজী হননি। প্রয়োজন কেন বুঝিয়েছিলাম। মানেন নি।

নিমাইদা বলেছিলেন, "তোমরা মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ। শীতে দক্ষিণ ভারত ঘুরে এসেছি। কিছু লাগেনি।"

—আপনার না লাগুক। বৌদি, সুরমাদির তো লাগবে।

—কারও লাগবে না। তোমরা ভয়েই ম'লে।

শুধু অবাক হয়েছি। এ কেমন লোক! হিমালয়ের পথের দুর্গমতার কথা, আবহাওয়ার কথা কিছুই কি জানেন না? নিজে না জানলেও আমাদের কথা তো শোনা উচিত। কেনাতে পারিনি। এখন তো কেনাতেই হবে। না হলে যে বিপদে পড়বে। আমরা যা কষ্ট করেও বোঝাতে পারিনি, গৌরীকুণ্ডের ঠাণ্ডায় উনি সহজেই বুঝলেন যে হিমালয় দক্ষিণ ভারতে নয়। কিনলেন।

এই উত্তরাখণ্ড হর ও পার্বতীর নানা লীলাকাহিনীর সঙ্গে জড়িত। এখানে নাকি গৌরী প্রথম ঋতুস্নান করেন। তাই এর নাম গৌরীকুণ্ড। তবে এই প্রচণ্ড শীতে উষ্ণকুণ্ডে স্নান করে আমাদের মতো যাত্রীদের পথক্লান্তি যে দূর হয় তাতো অস্বীকার করার উপায় নেই। শীতের দেশে উষ্ণকুণ্ডে স্নানের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নেই। দিন ও রাত্রি একই ব্যাপার।

"নিমাইদা, স্নান করবেন নাকি?" জানতে চাই।

—ক্ষেপেছ?

—বৌদিরা।

—কেউ না। তোমরা কর।

আমরা স্নান করি। শরীরের ক্লান্তি চলে গেল। বড় আরাম।

আলাপ হলো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। একটু আগেই ফিরেছেন কেদারনাথ থেকে। জানালেন, আমরা যেতে পারব না। মন্দির প্রাঙ্গণে দু'ফুট পুরু বরফ জমে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো। পাহাড়ে বৃষ্টির জোর কত! ভাবি, ভাগ্যই খারাপ।

কনকনে ঠাণ্ডায় কোনরকমে সন্ধে হতেই খেয়ে নেওয়া গেল। বাঙালীর ভীড় সুপ্রিয়া হোটেলেই। কারণ ওটা যে বাঙালীর প্রতিষ্ঠান এবং বাঙালী রান্নার স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য হোটেলের ব্যবস্থা

আরও ভাল এবং একই রান্নার পদ্ধতি।

বাইরে প্রবল বৃষ্টি। দারুণ ঠাণ্ডা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাশেই ঝাঁপিয়ে পড়া মন্দাকিনীর গর্জন। ঘরের মধ্যে কতক্ষণ মোম জ্বালিয়ে চুপচাপ বসে থাকা যায়? কম্বল জড়িয়ে যে যার শুয়ে পড়া। আমরা কি কেদারনাথ যেতে পারব না? পরমানন্দ বলে, "ভাবছিস কেন? সকালেই দেখবি আকাশ পরিস্কার।"

—কেদারনাথে যে বরফ পড়ছে?

—অনেকেই অনেক কথা বাড়িয়ে বলে। না পারলে ফিরে আসব।

ভোর হয়েছে ভেবে ঘুম ভাঙতে দেখি তখন রাত মাত্র এগারটা। হবেই তো। ছটায় শুয়েছি যে। তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ঝাঁপিয়ে পড়া মন্দাকিনীর গর্জন। কান পাতা দায়। পাশের লোকের সঙ্গেও চেঁচিয়ে কথা না বললে কিছু শোনা যায় না।

"এই ওঠ্, ওঠ্, তৈরী হয়ে নে।"—পরমানন্দর ডাকে উঠে বসি।

ভোর পাঁচটা। পরিস্কার আকাশ। তারারা মিটিমিটি জ্বলছে। নিচের দোকানে ততক্ষণে চায়ের জল চেপে গেছে। সবাই তৈরী হয়ে নিই। কাঁধে ঝোলা। হাতে লাঠি। 'জয় কেদার'— যাত্রা শুরু করি।

"বাবু, ঘোড়া নেহি লেগা?"—ঘোড়াওয়ালার প্রশ্ন। যেতে আসতে নব্বই টাকা নেবে শুনে আর দাঁড়াই না। চলা থামে না। চারজনের কাঁধে চড়া ডাণ্ডি এবং একজনের পিঠে ঝুড়িতে বসা কাণ্ডিও আছে। আমাদের কোনটাই দরকার নেই। নিজের পা অবস্থা বুঝে ফেলব। চোখ ফেরাতে পারব এদিক ওদিক।

গৌরীকুণ্ড থেকেই চড়াই শুরু। চৌদ্দ কিলোমিটার পথ। কতই বা আর কষ্ট হবে? লোক চলাচল আছে। পথের বাঁ পাশে পাহাড়ের গা, ডানপাশে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। পাথর বসান পথ। ঘোড়ার মলের ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ। পাও পিছলে যায়। ডাণ্ডি-কাণ্ডি-ঘোড়ায় চড়া যাত্রীদের যাবার সময় পাহাড়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে

দিতে হচ্ছে। শুধু পদযাত্রী হলেই যেন এই পথে বেশি মানাতো।

তিন কিলোমিটার পথ বেশ আসা গেল। জঙ্গল চটি। পকোড়া সহযোগে চায়ের সাথে একটু বিশ্রাম। মন টানছে কেদারনাথ। তাই বেশিক্ষণ বসার উপায় নেই। চলেছে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের নানা শ্রেণীর মানুষ। কেদারনাথ তৃষা তাদের ঘরছাড়া করেছে। এই ঠাণ্ডায় বিহারের এক মহিলা চলেছেন। খালি পা। শীতবস্ত্র বলতে একখানা সুতির চাদর। জিজ্ঞেস করি, "মাঈজী, আপনার কষ্ট হচ্ছে না?"

প্রশান্ত উত্তর শুনি, "কেদারনাথ দর্শনে যাচ্ছি। কষ্ট কেন হবে? শুধু ভয় হয়, দর্শন পাব তো?"

জঙ্গল চটিতে এবং পথের নানা জায়গায় উপরে ত্রিপল দিয়ে কয়েকটি দেব-দেবীর ফটো ঝুলিয়ে মন্দির বানানো হয়েছে। কোথাও বা ওভার হ্যাঙের মধ্যে ভস্মমাখা সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। কিন্তু যাত্রীদের ভক্তি কোথাও দানা বাঁধছে না। সবারই পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে "জয় কেদার" ধ্বনি এবং এগিয়ে যাওয়া। ঐ ধ্বনিই যেন অশক্ত ক্লান্ত শরীরে শক্তির সঞ্চার করছে।

জঙ্গল চটি থেকে পাঁচ কিলোমিটার পরে পাব রামওয়াড়া চটি। বেশ চড়াই। বুকে হাঁফ ধরছে। চলতে চলতে লাঠিতে ভর দিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে হচ্ছে। তিন বঙ্গসন্তান বোতল থেকেই গলায় ঢালছেন। এই পথে মদ নিষিদ্ধ। বলি, "এতটা উচ্চতায় এবং চড়াইর পথে নাই বা খেলেন?" কিন্তু কে কার কথা শোনে?

এগিয়ে চলি। রাস্তায় দেখা হয় এক যুবতী সুন্দরী বধূর সঙ্গে। অপেক্ষা করছেন পিছনে থাকা সঙ্গীর জন্য। আমরাও একটু দাঁড়াই। কিছু পরেই ঐ তিনজনের আবির্ভাব এবং বউটিকে ধমক, "তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

—একা একা কি করে যাব?

—এত লোক যাচ্ছে। তুমি তাদের সঙ্গে যেতে পারছ না?

বউটি অভিমানে হাঁটতে থাকে। যে কোন অসতর্ক মুহূর্ত মানেই

পতন। পাশের গভীর খাদ যেন মৃত্যুরই ইশারা করছে। যে পথে মানুষ সঙ্গীকে নিরাপত্তা দেবার কথা ভাবে, সেই পথে শুধু নেশার তাগিদে বউকে সঙ্গ দিতেও কার্পণ্য! ঝোলা তুলে চলতে থাকি।

গৌরীকুণ্ড থেকে আট কিলোমিটার এসে পৌঁছলাম রামওয়াড়া চটিতে। দোকানপাট, ঘরবাড়ি। থাকবারও ব্যবস্থা রয়েছে। চড়াই ভেঙে এসে এখানে থেকে পরদিন কেদার গেলে কষ্ট কম হয়। বিশ্রামও পাওয়া যায়। দোকানে ভাজাভুজি ও চায়ের অর্ডার দিয়ে একটু আয়েস করে বসা গেল। এই চড়াই ভাঙতে মেজাজও রুক্ষ হয়ে উঠতে চায়।

"ইয়ে কেয়া খানা পাকায়া? এই খানা কা দাম ছে রূপায়া?" ঘরের মধ্যে চৌকিতে সপরিবারে খেতে বসা এক মাঝবয়সী বাঙালী ভদ্রলোকের তর্জন ভেসে আসে। এখানে খাবার বলতে তো খিচুড়ি বা ভাত। সাথে পাঁপর ভাজা ও আলুর তরকারি। তাই বানাতে কত যে সময় যায়! এই ঠাণ্ডায় সিদ্ধ করা যা ঝকমারি। বাঙালী হওয়ায় আমরা একটু লজ্জিতই হই। কিন্তু দোকানীর কোন ভাববৈকল্য নেই।

—কেয়া, শুনতা নেহি? ইয়ে খা সক্‌তা?

—ইধার তো আউর কুছ্ নেহি মিলতা বাবুজী।

—নেহি মিলতা তো হোটেল দিয়া কাহে? পইসা নেহি দেগা।

দোকানদার হাসছে। বলছে, "পইসা আভি মাৎ দিজিয়ে। কেয়া, ঘর যাকে ভেজ দিজিয়ে। নেহি দেগা তব্ ভি আচ্ছা। লেকিন পেট ভরকে খানা তো খাইয়ে।"

এই পথকষ্টে, উচ্চতায় অনভ্যস্ত যাত্রীর মেজাজ অভিজ্ঞ দোকানদারের বুঝতে অসুবিধে নেই। সে তাই অভদ্র আচরণও সহজ মনে মেনে নিতে পারে। জানে, একটু বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে। হলোও তাই। খাওয়া শেষ হতেই ভদ্রলোক দোকানদারের সঙ্গে আলাপ শুরু করেছেন। স্বস্তি পাই।

আবার চলার শুরু। এখনও আট কিলোমিটার পথ যেতে হবে। চড়াই। প্রায় দুই কিলোমিটার পরেই শুরু হলো তুষারপাত। সারা

শরীর সাদা হয়ে গেল। অক্টোবরের মাঝামাঝি। সঙ্গে কেউ আনি নি ছাতা কিংবা বর্ষাতি। তুষারপাতের প্রথম অভিজ্ঞতা। হকচকিয়ে গেলাম। তারই মধ্যে দেখছি, ডানদিকের পাহাড়ের অপূর্ব সবুজ শোভা। মাঝে-মধ্যেই নেমে এসেছে বিনুনীর মতো ঝরণাধারা। কোথাও সেই জলধারা বরফ হয়ে রয়েছে। দেখার আনন্দ ও ভেজার ভয় মিলেমিশে এক অদ্ভুত অনুভূতি। কোথাও যে দাঁড়াব এমন কোন আশ্রয় নেই। কি করব? পরমানন্দ বললো, "পিছুলেও যখন দুই কিলোমিটার পথ ভিজতেই হবে, তখন এগিয়েই চল।"

সুতরাং চরৈবেতি, চরৈবেতি। দশ মিনিট পরেই নির্মল আকাশ। কে বলবে যে একটু আগেই এমন কাণ্ডটা ঘটে গেছে! হিমালয়ের মুহূর্তমধ্যের পরিবর্তিত রূপ কে বোঝাতে পারে?

পথে পড়লো গরুর চটি। একটু বসা যাক। কেদার থেকে ফিরছেন এক যুবদম্পতি। গাড়োয়ালেরই ছেলে। শ্রীনগরে ডাক্তারি করেন। কেদারনাথ দর্শনের ঘোর লেগে রয়েছে মনে ও চোখে। এই বারই প্রথম এসেছেন। বললেন, "এতদিন মনে হতো পয়সাই সব। আজ কি মনে হচ্ছে জান? পয়সা কিছুই নয়। এমন কেন হলো বল তো?"

কিই বা উত্তর দেব? নাস্তিক হবার সাহস নেই। অস্তিত্ব বুঝবার মত জ্ঞান বা ভক্তি নেই। শুধু জেনেছি, যুগ যুগ ধরে মানুষ কেদার নাথের পদপ্রান্তে ছুটে আসছে পরম প্রাপ্তির আশায়। দর্শন করে মনে নিয়ে যায় পরম তৃপ্তি। সে পাওয়ার আনন্দ, না দেখার আনন্দ জানি না।

বৈজ্ঞানিক মন। তাই ডাক্তার আবার প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, হিমালয়ে এত পাথর। তবু কেন কেদারনাথে এক শিলাখণ্ডকে দেবতা রূপে নির্বাচন করা হলো? এই শিলাখণ্ডটির কি কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে?"

এরও উত্তর জানা নেই। প্রশ্নটিও নতুন শুনছি। চুপ করে থাকি।

মনে মনে আকুল হই, কখন পৌছাব ? কী দেখব ?

গরুর চটি থেকে কিছুটা এসেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। শুচিশুভ্র আবরণে কেদার পর্বত কেদারনাথ মন্দিরটিকে যেন কোলে নিয়ে বসে আছে। মন্দিরশীর্ষে উড়ছে হলুদ ধ্বজা। 'দেওদেখনি' থেকে দেখামাত্রই যাত্রীদের আবেগাপ্লুত স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনি "জয় কেদার।"

চলার গতি দ্রুত হয়। কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে না। আড়াল পড়ে গেছে।

সামনেই বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। এখান থেকে তিন ঘণ্টার হাঁটা পথ পার হলে চোরাবাড়িতাল। দু'মাইল বিস্তৃত হ্রদ। এই হ্রদই মন্দাকিনীর উৎস। এই পথেই রয়েছে চড়াই ভেঙে আট কিলোমিটার দূরে শোন বা বাসুকি গঙ্গার উৎস দেড় মাইল বিস্তৃত নীল তুষারগলা জলের হ্রদ বাসুকিতাল (১৫৫০০ ফুট)। বাসুকিতালে প্রচুর ব্রহ্মকমল ফোটে। সেই ফুলে পুজো হয় কেদারনাথের। যাবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু পথ এখন বরফে ঢেকে গেছে। যাওয়া যাবে না।

এই প্রচণ্ড শীতেও দেখছি অনেকে নদীতে স্নান করছে। ছোট্ট সেতু পার হয়ে পৌঁছই কেদারনাথে। ছোট্ট সরু পথ। পথের দু'পাশে গায়ে গায়ে লেগে আছে কাঠের ঘরগুলি। টিনের চালা। চালা থেকে ঝুপ-ঝুপ করে গায়ে মাথায় ঝরে পড়ছে জমা বরফ।

"একটু দেখুন না, মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।" দেখি এক বৃদ্ধা রাস্তার ধারে শুয়ে। পাশে এক মহিলা। তাঁরই অনুরোধ। এঁরা ডাণ্ডিতে এসেছেন। এই উচ্চতায় শ্বাসকষ্টে বৃদ্ধার অবস্থা কাহিল। পরমানন্দ তক্ষুনি শুশ্রূষায় তৎপর। রাস্তায় কি রাখা যায় ? কোথায় উঠবেন এঁদের জানা নেই। স্থানীয় লোকরাই ব্যবস্থা করে পাশের একটি ঘরে শুইয়ে দিল। পরে যা হয় ব্যবস্থা হবে। পথে দেখা বউটি এসে পৌঁছালেন। একা। উনিও এদেরই দলের। অর্থাৎ সেই ছেলে তিনটির দল। পথে যেমন দেখেছি নেশার ব্যবস্থা করতে, তাতে কখন পৌঁছাবে কে জানে ? আমাদেরও তো থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে

হবে। কিন্তু এঁদের ছেড়েই বা যাই কি করে? অবশেষে ছেলে তিনটি এলো। ঘটনা শুনে চলে গেল বৃদ্ধার কাছে। না, এদের কাছে 'ধন্যবাদ' শব্দটাও আশা করি না।

কেদারনাথের মন্দির এখন বন্ধ। আবার খুলবে সন্ধে ছ'টায় আরতির সময়। সুতরাং এখন আস্তানার খোঁজ করা যাক। হোটেল হিমলোক, ট্রাভেলার্স লজ, মন্দির কমিটির গেস্ট হাউস, গুজরাট ভবন, বিড়লা গেস্ট হাউস, জম্মু-কাশ্মীর গেস্ট হাউস, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বিভিন্ন ধর্মশালা, পাণ্ডাদের বাড়ি, থাকার কোন ভাবনা নেই। আমরা বোম্বে লজে উঠলাম। চারপাশে অবাধ দৃষ্টি দেওয়া যায়। কোথাও কোন বাধা নেই।

এক দোকানে খাবারের অর্ডার দেওয়া হলো। ছয় টাকা মিল চার্জ। খিচুড়ি, আলুর তরকারি, পাঁপর ভাজা ও চাটনি। সব দোকানে একই মেনু ও সমান দর। এই ঠাণ্ডায় পথশ্রমের পর গরম খাবার যা পাওয়া যায় তাই অমৃত। ধনী-গরীবের জন্য একই খাবার। এই যা সান্ত্বনা।

এতদিনের বাসনা আজ তৃপ্ত। দেখছি কেদারনাথ মন্দির। পিছনেই কেদার পর্বত। বরফে ঢাকা। তারই মধ্য থেকে বেরিয়ে আছে কিছু কিছু পাথর। জানান দিচ্ছে 'আমরাও আছি'। দু'পাশে অপেক্ষাকৃত ছোট পাহাড়গুলি যেন ডানা মেলে দিয়েছে। সামনে ঢালু হয়ে নেমে গেছে যে প্রান্তর, তাও বরফের চাদরে ঢাকা।

প্রশস্ত মন্দিরচত্বরে মূল দরজার সামনেই রয়েছে বৃহদাকারের নন্দী মূর্তি। শিবের বাহন খানিক বিশ্রাম নিচ্ছে। দেবাদিদেবের চলার আদেশের জন্য অপেক্ষমান। কী নিখুঁত সুন্দর গড়ন! ঘুরে ঘুরে দেখছি ভৈরব শিলা, মধুগঙ্গা, ক্ষীরগঙ্গা। মন্দিরের ডান পাশে রয়েছে আদি শংকরাচার্যের সমাধি-মন্দির। আপনা হতে মাথা নত হয়ে যায় এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জীবনকথা ভাবলে।

"এই মন্দির কে তৈরী করেছেন বল তো?" বৌদি জানতে চান।

প্রবাদ আছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্বজন হত্যার পর পাণ্ডবরা পাপ-মুক্ত হতে তীর্থদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। বিভিন্ন তীর্থ ঘুরতে ঘুরতে চলে আসেন এই কেদারখণ্ডে। কোথাও মহাদেবের দেখা পান না। ওঁরাও খোঁজেন, মহাদেবও পালিয়ে বেড়ান। শেষ পর্যন্ত মোষের ছদ্মবেশে শিবকে চিনতে পেরে ভীম তাঁকে জাপটে ধরেন। প্রায় সর্বশরীর ভূমির নিচে গেলেও পিঠ আর সরাতে পারেন নি। এখানেই স্থিতি হয় শিবের। পাণ্ডবরা গড়ে তোলেন এই মন্দির। এটি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি।

"সত্যিই কি পাণ্ডবরাই তৈরী করেছিলেন?" — নিমাইদার সন্দেহ-জনক প্রশ্ন।

তাতো আর সত্যিই জানি না। তবে এই মন্দিরের প্রাচীনত্ব সন্দেহাতীত। তার থেকেও বড় কথা, যিনি বা যাঁরাই তৈরী করে থাকুন তাঁর স্থান নির্বাচন যে কত বিস্ময়কর আজকের দিনেও ভাবা যায় না। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিখুঁত গঠনশৈলী। তিনি ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক মহান শিল্পী। সুন্দরই শিব। সুন্দরতম স্থানই তো তীর্থ। তাই তো কেদারনাথ মহাতীর্থ।

সন্ধে ছ'টায় মন্দির খুললো। শিবলিঙ্গকে রাজবেশ পরানো হয়েছে। মখমলে ও জরির মোড়কে মাথার ছত্র ঝিকমিক করছে। সন্ন্যাসীরা গর্ভগৃহের গম্বুজের পাশে দাঁড়িয়ে প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে সমস্বরে উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করছেন। ধূপ-চন্দনের গন্ধ যেন স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তারপর শুরু হলো বিভিন্ন বাদ্যসহযোগে নৃত্যারতি। নটরাজের প্রাঙ্গণে তাঁকে নৃত্য-গীতেই তো পূজা মানায়। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। ঘুরে ঘুরে পুরোহিত নিজেই যখন কপালে পঞ্চপ্রদীপের শিখার হাত ছোঁয়ালেন তখনই ঘোর কেটে গেল।

ঘরে ঢুকে যে যার কম্বলের তলায়। ৩৫৮১ মিটার উচ্চতায় অক্টোবরের শেষে ঠাণ্ডায় জমে যাবার অবস্থা। কম্বলও ভেজা মনে

হয়। ঘুম আর আসে না। কেদারনাথ কেবলই মনকে আনমনা করে দিচ্ছেন। একসময় দরজা খুলে এসে দাঁড়াই কাচঘেরা বারান্দায়।

বিস্ময়-বিমূঢ়! এ কী অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য!! যে দিকে চোখ যায় শুধুই বরফ। স্বচ্ছ আকাশে আজ বিজয়া দশমীর চাঁদ। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল। মনে হয়, হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। তারই আলো বরফে ঠিকরে পড়ছে। এমন শুভ্র জ্যোৎস্না আগে তো কখনও দেখি নি। কানে যেন এখনও বাজছে সেই বাদ্যধ্বনি। তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়েই থাকি।

একসময় সকাল হয়। শুরু হয় কলগুঞ্জন। আবার যাই মন্দিরে। এখন পুণ্যকামীদের ভীড়। সবাই পূজা দিতে ব্যস্ত। পাণ্ডাদের এলোমেলো মন্ত্রপাঠ মন্দিরের শান্ত পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। প্রদক্ষিণ করে স্পর্শ করি কেদারনাথকে। প্রোথিত একখণ্ড পাহাড়শীর্ষ শিলা। উঁচু-নিচু মসৃণ খাঁজ। মোষের পিঠ যেন। মনে বড় আনন্দ হয়। সব মন্দিরেই অর্থকৌলিন্যে দেবতা থেকে ভক্তদের দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু কেদারনাথ? ধনী নেই, গরীব নেই, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-হরিজন নেই। কেদারনাথের কাছে সবাই আপন। এসো, স্পর্শ কর, আলিঙ্গন কর। ভগবানের জন্য ভক্ত নয়। এখানে ভক্তের ভগবান।

এবার ফেরার পালা। যতই যাই ততই ফিরে তাকাই। এই ফিরে তাকানো কোন দিন বন্ধ হবে কি?

ফিরে আসি গৌরীকুণ্ডে। কেদার দর্শনের তৃপ্তি নিয়ে মন এবার চোখকে দেখায় গাছগাছালি। চীর পাইন, রডোডেনড্রন, বন ওক্, দেওদার, বার্চ, হিমালয়ের উচ্চতম গাছ Moru Oak (Quercus Floribunda), বক্স উড। গাছের ছায়ায়, পাতার আড়ালে, কখনও উড়ে চলা কত কী পাখি! সবাইকে চিনি না। তবে ভাল লাগে।

গৌরীকুণ্ড থেকে ভোরবেলা বাস ছাড়বে। একটি বাস উখীমঠ-চোপতা-গোপেশ্বর হয়ে সরাসরি যাবে বদ্রীনাথ। আমরা তাতে যাব না। যাব ত্রিযুগীনারায়ণ। অন্য এক বাস ধরে পাঁচ কিলোমিটার এসে নামলাম সোনপ্রয়াগে। বেশ কয়েকটি চটি রয়েছে পথের দু'পাশে।

জঁাক নেই, কিন্তু আশ্রয় তো আছে। খাবারও পাওয়া যাবে। পাইন ও ওক্ গাছ বিশাল উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কানে আসছে জলের প্রবল আওয়াজ। সোনপ্রয়াগে মন্দাকিনী এসে মিশেছে সোনগঙ্গার সঙ্গে। একেই উঁচু থেকে নেমে আসা, তায় আবার সঙ্গম। মাত্র কয়েক বছর আগেও এই প্রয়াগতীর্থ ছিল জমজমাট। এখান থেকেই যাত্রীরা হাঁটা শুরু করতো কেদারনাথে যাবার জন্য। বাসপথ এখন এগিয়ে গেছে। যাত্রীর নামার আর প্রয়োজন হয় না। আমরাই আজ একমাত্র যাত্রী।

বাসপথ থেকে পাঁচ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে যেতে হবে আমাদের। কাছে এগিয়ে এলো ঘোড়াওয়ালা। আমাদের প্রয়োজন নেই জানিয়ে দিই। কিন্তু সে আশা ছাড়ে না। ঘোড়া নিয়ে পেছন পেছন চলতে থাকে।

"বাবুজী, গাইড নেহি লাগেগা ?" পাশে এসে দাঁড়ায় এক বৃদ্ধ। ছিন্ন খাকি পোষাক। মাথায় উলের টুপি, তাও ছেঁড়া। পায়ের আঙুল কাপড়ের জুতো থেকে উঁকি দিচ্ছে।

পরমানন্দ সাফ জানিয়ে দেয়, "কই গাইড নেহি লাগেগা।" লোকটি বড় ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু সঙ্গে চলতেই থাকে।

জিজ্ঞেস করি, "রেট কিত্না ?"

চোখে একটু আশার আলো। জানায়, "বিশ রূপেয়া।"

জানিয়ে দিই যে গাইডের কোন দরকার নেই। আবার হতাশা। তবু সঙ্গ ছাড়ে না। প্রায় এক কিলোমিটার এসে হতাশ ঘোড়াওয়ালা ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু গাইড যে চলছেই। এবার অনুরোধ করে, "বাবুজী, গাইড সমঝো, কেয়া পাণ্ডা সমঝো, কেয়া কুলি সমঝো, হামকো লে চলো।"

থমকে যাই। অদ্ভুত কাকুতি। গাইড-পাণ্ডার কৌলিন্য থেকে বাস্তব প্রয়োজনে কুলি পর্যন্ত অবনমন! কিন্তু যার প্রয়োজন নেই তার জন্য খরচই বা করব কেন ? তবু বলি, "পাঁচ রূপেয়া দেঙ্গে। চলোগে ?"

আত্মসম্মানে ঘা লাগে। কিন্তু বাস্তব অনুভব ক'রে তখনই আবার মিনতি, "বাবুজী, দশ রূপেয়া।"

—কই জরুরত নেহি। তুম যা সক্‌তে।

চড়াইর পথ। দুই কিলোমিটার চলে এসেছি। গাছের ছায়ার মধ্য দিয়ে পথ চলেছি। এপাশে ওপাশে মাঠে মেয়েরা ফসল তুলছে। বাচ্চা মেয়েরা বিচিত্র গাড়োয়ালী পোষাকে গরু চরাচ্ছে। আমাদের দিকে কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। তাদেরই মধ্যে দু'একজন এগিয়ে এসে হাত পাতছে, "পইসা দোও।"

বৃদ্ধের আবার অনুরোধ, "আট রূপেয়া দিজিয়ে বাবুজী। হামকো লে চলিয়ে।"

এবার রাজি হই। জিজ্ঞেস করি, "তুমহারা নাম কেয়া হ্যায় ?"

—গুণানন্দ। তুমলোগ চলতে রহো। ম্যায় আভি লাঠি বানাকে লে আতে হ্যায়।

মুখে কী আনন্দের ছটা! মুহূর্তে গুণানন্দ উধাও। আমরা কিছুটা এগিয়েই আর ঠিক করতে পারি না কোন দিকে যাব। পথ এখানে তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। কাছেপিঠে কোন লোকও নেই। লোকালয় তো দূরের কথা। চীৎকার শুনতে পাই, "উধার নেহি বাবুজী, ডাইনা তরফ চলো।" ছুটে আসে গুণানন্দ। হাতে সবার জন্য একটা করে লাঠি। গাছের ডাল কেটে বানিয়ে এনেছে। ভরসা পাই। নির্ভয় হই। ভাল লাগে।

গভীর বনের মধ্য দিয়ে চলেছি। মাটি থেকে ভেজা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে। কতকাল এখানে সূর্যের আলো পড়ে নি কে জানে? গাছের ডালে ঝুলছে বিরাট এক সাপের খোলস। আশে পাশে নেই তো? গুণানন্দ জানায় যে এখানে অনেক সাপ। যখন তখন জান নিয়ে নেয়। কোন বিচার নেই।

চলতে চলতে গুণানন্দ চিনিয়ে দিচ্ছে গাছ-গাছরা। পথের পাশে ভাঙ্‌ গাছের জঙ্গল। এখানে ওখানে ফুটে রয়েছে দোপাটি, গাঁদা,

জিনিয়া, তুপুরে ফোটা ফুল। নিবিড় জঙ্গল এ পথের প্রাচীনত্ব মনে করিয়ে দেয়।

গুণানন্দ ডান দিকে দেখিয়ে বলে, "নীলকণ্ঠ"। অপূর্ব্ব শোভা। সব সময়েই বরফাচ্ছাদিত। কণ্ঠ বরাবর বরফের পাতলা আস্তরণ ভেদ করে পাথর বেরিয়ে রয়েছে। মনে হয় যেন কন্ঠির মালা। শুভ্র অঙ্গে নীলের ছোপ। যুগ যুগান্ত ধরে ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি। রূপের সাথে সঙ্গতি রেখে সার্থক নাম নীলকণ্ঠ। আশপাশে ছোট ছোট আরও কয়েকটি পর্বতশিখর যেন তাঁর চেলাচামুণ্ডা।

প্রায় তিন কিলোমিটার চড়াই ভাঙার পর পৌঁছে গেলাম শাকম্বরী দেবীর মন্দিরে। পাথর ও মাটির মিশ্রণে বানানো দেয়াল। খড়ের ছাউনী। তারই মধ্যে আরও কিছু দেব-দেবী জায়গা করে নিয়েছেন। পাশেই একটি গাছের ডালে অসংখ্য নানা রঙের কাপড়ের টুকরো বাঁধা। মানত্ করা হয়েছে। দেবী বড়ই জাগ্রতা। পূজারী চায়ের দোকানও করেছে। এই পথে খদ্দের কবে আসবে বা ক'জন? তবুও ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। গুণানন্দর তদারকিতে চা প্রায় গেলাস ভর্ত্তি তুধের রূপ নিয়ে এলো। ক্লান্তিও অনেকটাই দূর হলো।

আবার চলার শুরু। পথটি বড় মনোরম। পাথরের রুক্ষতা নেই। খাদের বিভীষিকা নেই। পথ চলতি ডাণ্ডি-কাণ্ডি-ঘোড়ার উৎপাত নেই। হয় গভীর অরণ্য, নয়তো যেন সাজান বাগান। মাঠের পাশ দিয়ে ঘাস বিছানো পথ। নির্জন-শান্ত পরিবেশ। যেখানে অরণ্যের গভীরতা নেই, মুক্ত নীল আকাশ। কোথাও থেকে দেখা যাচ্ছে পাহাড়চূড়া। পথের চড়াইর কষ্ট থাকলেও আকর্ষণ আছে। ভীতি নেই। যুগ যুগ ধরে তাই এই পথের আকর্ষণে ছুটে এসেছেন ভ্রমণবিলাসী।

পথের উপর দিয়ে পাথর ডিঙিয়ে নেমে এসেছে ঝরণাধারা। তারই কুলুকুলু ধ্বনি এই পথেরই মানানসই সঙ্গৎ। লাফানো-ঝাঁপানো নেই। ভয় দেখাবার প্রবণতা নেই। লোকহিতে নিজের স্বচ্ছন্দ অবতরণ।

ছোট্ট পুল পার হয়েই দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি মন্দিরচূড়া। কেদার-

বদ্রীর মতো 'দেওদেখনি' থেকেই আবেগাপ্লুত জয়ধ্বনি নেই। মনে রয়েছে আগ্রহ। আকুলতা। কখন দর্শন হবে। লোকালয়ে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগে না। লাগোয়া বাড়ি-ঘর। আর্থিক কৌলিন্যের কোন ছাপ নেই। দুপাশে দোকানের সারি। সামনেই মন্দির। উচ্চতা প্রায় ৩০০০ মিটার।

মন্দির চত্বরে পৌঁছেই মন অদ্ভুত তৃপ্তিতে ভরে গেল। সেই কত হাজার বছর পৌরাণিক যুগে ফিরে এসেছি যেন। শান্ত, মনোরম পরিবেশে শিব-পার্ব্বতীর নিভৃত বিহার। কথিত আছে, এখানেই শিব-পার্ব্বতীর বিয়ে হয়। সেই মহান অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকেন সর্ব্বগুণাধার বিষ্ণু। তাই প্রতিষ্ঠিত হয় এই অপূর্ব স্থন্দর মন্দির। অধিষ্ঠান করেন নারায়ণ। বিবাহের সাক্ষী হয়ে আছেন তিন যুগ ধরে। তাই এই মন্দির ত্রিযুগীনারায়ণ।

"কেয়া সাদী কে লিয়ে ?"—বাসে পাশে বসা গাড়োয়ালী কন্যা পার্ব্বতীর হাসির ঝংকার কানে আসে। মনে পড়ে ওর তির্যক চাউনী। মন একটু আনমনা হয়ে যায়। পাশেই দেখি বৌদি— যাঁর গম্ভীর মন্তব্য, "তোমার কপালে কচু পোড়েংগা।" হেসে ফেলি।

মন্দিরের শিল্পশৈলী প্রায় কেদারনাথ মন্দিরেরই মতো। শুধু সামনে নেই বৃহদাকার বৃষ মূর্ত্তি। ধূপ-চন্দনের গন্ধ ও স্তিমিত প্রদীপের আলোয় মায়াময় স্বর্গীয় পরিবেশ। পুরোহিত কপালে পরিয়ে দিলেন চন্দনের ফোঁটা। হাতে দিলেন প্রসাদী ফুল। পূজার জন্য কোন পীড়াপিড়ি নেই।

গুণানন্দ জানিয়ে দেয় সব জায়গায় পূজা বা প্রণামী দেবার দরকার নেই। মন্দিরচত্বরে রয়েছে কয়েকটি জলাধার। কুণ্ড। বিভিন্ন মাহাত্ম্য। মাত্র একটি কুণ্ডে পূজা দেবার জন্য গুণানন্দ একটি টাকা চেয়ে নিল। সর্বদা সতর্ক, যেন কেউ আমাদের না ঠকায়। কুণ্ডের জলে শ্যাওলার রঙ ধরেছে। তাতেই এক সাধু স্নান করে নিচ্ছেন।

"ইধার লকৃড়ি চড়াইয়ে বাবুজী।"— আবেদন এক বৃদ্ধের। জীর্ণ
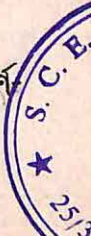
দশা, ছিন্নবেশ। দেখি, মন্দিরের সামনেই জ্বলছে যজ্ঞাগ্নি। অখণ্ড ধুনি। শিব-পার্ব্বতীর বিয়ের যজ্ঞাগ্নি এখনও অনির্বাণ। পুণ্যার্থীরা পরম শ্রদ্ধায় মাথায় মাখেন এই যজ্ঞভস্ম। গুণানন্দর দিকে তাকাই। ওর কোন অভিব্যক্তি নেই। আগুনে কাঠ না দিয়েই এগিয়ে যাই।

মন্দিরের চারপাশে ঘরবাড়ি। এককালের কোলাহলমুখর জমজমাট জায়গা আজ যেন রিক্ত। এখান দিয়েই এক সময় তীর্থযাত্রীদের যেতে হতো কেদারনাথ বা গঙ্গোত্রী। আজ সভ্যতার বিকাশে বাস রাস্তা হওয়ায় এই পথের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে।

চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। বাড়ান হাত—'পইসা দোও'। হায় রে! এক কালের সমৃদ্ধ জনপদ আজ ভিখারীর রূপ নিয়েছে। যা পারি দিই। এসে বসি এক খোলা বারান্দায়। এক কোণে বসে একজন লোক একমনে ভেড়ার লোম থেকে উল বানাচ্ছে। অসহায় দৃষ্টি। অভিযোগ জানালো, "বাবুজী, তুমলোগ লক্ড়ি নেহি চড়ায়া। চড়ানেসে এক দো রূপায়া হাম্‌কো মিল্‌তা। জঙ্গলসে লক্ড়ি লানে পড়তা। এহিসে বাল-বাচ্চাকা দানাপানিকা ইন্তেজাম হোতা।"

মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভক্তি বা বিশ্বাসের অভাবে যুক্তিবাদী মনে অখণ্ড ধুনির বাস্তবতা অস্বীকার করা যায়। কিন্তু এই বিশ্বাসের মূল্যই যে বেঁচে থাকার রসদ জোগায় তা মনে রাখি না। চুপ করে থাকি।

একটি বছর চারেকের বাচ্চা কাঁদছে। প্রায় দশ হাজার ফুট উচ্চতায় দারুন শীতে বাচ্চাটার গাল ফেটে গেছে। নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে। বছর ছয়েকের আর এক বাচ্চা ওকে চুপ করাবার চেষ্টা করছে। জিজ্ঞেস করি, "কেয়া রে মুন্নি, রোতি কিঁউ?"

বাচ্চাটা আরও ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে, "হামকো পইসা নেহি মিলা।"

অনেককেই তো দিই নি। এও বোধহয় বাদ পড়ে গেছে। বলি, "রোও মৎ। তুমকো য্যাদা মিলেগি।" ওকেও পয়সা দিই। পরমানন্দ

মুহূর্তে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে সোজা মিষ্টির দোকানে। বলে, "খা, মিষ্টি খা।" কিন্তু 'মিষ্টি' কি বুঝলে তো? আর পরমানন্দও কিছুতেই 'মিঠাই' বলবে না। দোকানদারের অবশ্য বুঝতে কষ্ট হয় না। বাচ্চার মুখে খুশীর ঝিলিক। মনে মনে প্রশ্ন করি, "ত্রিযুগীনারায়ণ, এই মুহূর্ত্তেরও সাক্ষী থাকছ তো?"

এবার ফেরার পালা। গুণানন্দের কথা বলার শেষ নেই। বলবেই তো। এক সময়ের ডাকসাঁইটে পাণ্ডা এবং দুর্গম পথের গাইড ছিল যে ও। কত তখন রোজগার। কত মহাত্মার সান্নিধ্যের স্মৃতি। ও কি চুপ থাকতে পারে?

পৌঁছে গেছি সোনপ্রয়াগ। দোকানে আমাদের সাথে গুণানন্দকেও খেতে ডাকি। রাজি হয় না। বলে, অন্য দোকানে খাবে। ওকে খাবার টাকা দিয়ে দেয় পরমানন্দ। ওর প্রাপ্য আট টাকার জায়গায় দেয় পনের টাকা। এই আর একজন লোক! প্রথমে দর কষাকষি কিন্তু শেষে দেবে অনেক বেশি। পরমানন্দকে নিয়ে আর পারা যায় না।

আনন্দে গুণানন্দর চোখে জল। বাস আসার সময় হলো। ডাকি, "গুণানন্দ।"

—বাবুজী, হামকো গুণানন্দ মাৎ বোলো। নির্গুণানন্দ বোলো।

বিস্ময়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করি, "কিঁউ?"

জানায়, এক সময়ে ওর ভালই সঙ্গতি ছিল। মান ছিল। তিন ছেলে নিয়ে সংসারে আনন্দ ছিল। এক সময় যাত্রাপথ বদল হলো। গাইড ও পাণ্ডার কাজে আর আয় নেই। এক ছেলে হঠাৎ রোগে মারা যায়। আর এক ছেলে এই জঙ্গলের পথে সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। তাই তো বলছিল, "জান লে লেতা, কই বিচার নেহি।" আর এক ছেলে মিলিটারি। দুই ছেলের মৃত্যুর পর বউ রোগে শোকে শয্যা নেয়। খালি পথ চেয়ে থাকে কবে মিলিটারি থেকে ছেলে আসবে। টাকা পাঠাবে। আজ এই টাকা দেখিয়ে বউকে বলবে যে ছেলে টাকা পাঠিয়েছে।

জিজ্ঞেস করি, "টাকা পাঠায় না ছেলে?"

গুণানন্দ হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে, "নেহি বাবুজী। ও ভি তো মর চুকা। লেকিন বুঢ্ঢি নেহি জান্তি। তব হি তো বোলা বাবুজী, হামকো নির্গুণানন্দ বোলো।"

ওর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বলি, "তিন যুগ ধরে যিনি সাক্ষী হয়ে রয়েছেন তাঁর তো অজানা কিছু নেই। সেই ত্রিযুগীনারায়ণের কাছে তুমি গুণানন্দ নও, তুমি নির্গুণানন্দও নও। তুমি ত্রিগুণানন্দ।"

বাস এসে গেছে। সবাই উঠতে না উঠতেই ছেড়ে দিয়েছে। জানালা থেকে জানালায় মুখ বাড়িয়ে গুণানন্দ চেঁচাচ্ছে, "ভাইয়া বাবু-লোগকো বইঠনে দোও—বাবুলোগকো বইঠনে দোও।"

সন্ধের পর এসে পৌঁছলাম রুদ্রপ্রয়াগ। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই থাকবার জায়গা অনেক। আমরা উঠলাম কালীকম্লীর ধর্মশালায়। প্রথমে তো দামী হোটেল বলেই ভুল হচ্ছিল। আধুনিক সুসজ্জিত ঘর ভাড়ায় পাওয়া যায়। সব ভর্তি। সাধারণ ঘরে জায়গা পেলাম। তা হোক। ভাবি এই সাধক কালীকম্লীর কথা। যখন হিমালয়ের তীর্থ ছিল কল্পনাতীত দুর্গম, তখন যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি কোথায় না অতিথিশালা বানিয়েছেন! এবং একক সাধনায়। আজ সেই ধর্মশালা কোথাও জীর্ণ। কোথাও বা আধুনিক রূপ নিচ্ছে।

শীত বেশ কম। ঘরের সামনেই বিশাল উঠোন। তার নিচেই মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম। মন্দাকিনীর জল ঘোলাটে এবং অলকানন্দার স্বচ্ছ। রুদ্রনাথ মন্দিরকে দুই পাশ থেকে দুই নদী আলিঙ্গন করে পরস্পরের সঙ্গে মিশেছে। মন্দাকিনী এরপর থেকেই নিজের নামটি অলকানন্দাকে উৎসর্গ করে বিলীন হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না রাত। নিচে এই অপূর্ব মিলন দৃশ্য। নিশ্চুপ নিঝুম রাতে নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ধীরে ধীরে যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। আমরা তার ভাষা বুঝি না। চুপচাপ বসে থাকি। একটি রাত এমনই কেটে যাক না।

ভোরের বাস ধরে আবার চলার শুরু বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে। যাত্রীরা

ঘনঘন জয়ধ্বনি দিচ্ছে, “জয় বদ্রীবিশাল কী।”

৩২ কিলোমিটার পর ছেড়ে যাচ্ছি কর্ণপ্রয়াগ। মন চলে যায় অতীতে। দানবীর কর্ণের জন্য, ভাগ্যহত কর্ণের জন্য, মহাবীর কর্ণের জন্য কোথায় যেন রয়েছে সমবেদনার সুর। শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালবাসার মিশ্রণ। এখানে পিণ্ডার নদী এসে মিশেছে অলকানন্দার সঙ্গে। লোকশ্রুতি, এই সেই সঙ্গমতীর্থ যেখানে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে চেয়ে নেন কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডল। এখানে আছে উমা ও কর্ণের মন্দির।

আরও ১৯ কিলোমিটার এসে নন্দপ্রয়াগ। প্রয়াগ মানেই তো দুই নদীর সঙ্গম। এখানেও ব্যতিক্রম নেই। নন্দাকিনী এসে মিশেছে অলকানন্দার সঙ্গে। নন্দপ্রয়াগ থেকে আর একটি পথ চলে গেছে ঘাট পর্য্যন্ত। তারপর একে একে ছেড়ে যাচ্ছি ১০ কিলোমিটার পর জেলা শহর চামোলী এবং আরও ২১ কিলোমিটার পর পিপলকোটি। সব জায়গাতেই থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। মন চায় থেকে যাই এ সব জায়গায়। কিন্তু পথ তো আমাদের বাঁধনছাড়া করতে পারে নি। তাই হিসেবের দিন গুনে পথ চলা। এগিয়ে আমাদের যেতেই হবে।

পিপলকোটি থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূর যোশীমঠ (১৮৭৫ মিটার)। প্রাচীন তীর্থস্থান। আদি শংকরাচার্যের তপস্যাস্থল জ্যোতির্মঠ। এখানেই শীতের সময় বদ্রীনাথের পূজা হয়। বাস লাইন করে দাঁড়িয়ে গেল। দুপুরের পর ছাড়বে। এখান থেকে পথ ওয়ান ওয়ে। ওপাশ থেকে গাড়ি এসে পোঁছলে এপাশ থেকে ছাড়বে। তাই অপেক্ষা।

আবার হলো চলার শুরু। পথের অবস্থা দেখে বুক কাঁপছে। কত যে ধ্বস নামার জায়গা। এলোমেলো পরে থাকা পাথরের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে বাস এগিয়ে যাচ্ছে। পাশেই কলোচ্ছ্বাসে দুরন্তবেগে বয়ে যাচ্ছে অলকানন্দা। পাহাড়গুলিরও ভিন্ন রূপ। কোনটা শুধুই

রক। কোনটা সবুজ। কোনটা ন্যাড়া। নদীর উপর পুল পার হতে গিয়ে বাস যাত্রী নামিয়ে শরীর হাল্কা করে নিচ্ছে। যখনই এমন অবস্থা অতিক্রম করছি তখনই যাত্রীদের "জয় বদ্রীবিশাল কী" ধ্বনি আপনা থেকেই বেরিয়ে আসছে। ভয়ে না ভক্তিতে কে জানে।

বিষ্ণুপ্রয়াগও পার হয়ে গেলাম। যোশীমঠ থেকে ২০ কিলোমিটার পর পার হচ্ছি গোবিন্দঘাট (১৮২৮ মিটার)। এখান থেকে গিরিশিরা ধরে চলে গেছে হেমকুণ্ড ও ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ার্সের পথ। তারপর ছেড়ে যাচ্ছি পাণ্ডুকেশ্বর। প্রাচীন মন্দির ও আপেল গাছের সৌন্দর্য্য বাস থেকেই যতটা পারছি দেখছি। তারপর হনুমান চটি। 'দেওদেখনি' থেকে বদ্রীনাথের মন্দির এক পলক দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। মন উন্মুখ। এবারই তো পৌঁছাব বদ্রীনাথে।

গোবিন্দঘাট থেকেও ২২ কিলোমিটার, অর্থাৎ রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ১৫৮ কিলোমিটার পথ পার হয়ে পৌঁছলাম আকাঙ্ক্ষিত বদ্রীনাথে। থাকবার জায়গার জন্য কোন ভাবনা নেই। রেষ্ট হাউস, ট্যুরিস্ট বাংলো, ট্রাভেলার্স লজ, হোটেল তো আছেই। সব প্রদেশ ও সংস্থার রয়েছে বিভিন্ন ধর্মশালা। সামান্য চার্জ। কোথাও শুধুই দান। বাঙালীর ভীড় অবশ্যই বালানন্দ আশ্রমে। হোটেল দেবলোকের পাশে। সুন্দর পরিবেশ। বাঙালী রান্নার খাবারের জন্য কাছেই রয়েছে সুপ্রিয়া হোটেল ও বিখ্যাত পাণ্ডা হীরালাল ভট্টর গৃহসংলগ্ন হোটেল। বাড়তি সুবিধে, শহরটি এখান থেকে ভারি সুন্দর দেখায়।

আবহমানকাল ধরে পরম শ্রদ্ধায় পুণ্যার্থীরা ছুটে এসেছেন এই দুর্গমতীর্থ বদ্রীনাথে (৩১৩৩ মিটার)। মহাভারতের নানা জায়গায় উল্লেখ রয়েছে বদরিকাশ্রমের। এখানে ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল। পাণ্ডবরা নানা অবস্থায় বদরিকাশ্রমে এসেছেন। মন্দিরের নিচেই দেবর্ষি নারদের তপঃসিদ্ধস্থল নারদকুণ্ড—তপ্তকুণ্ড। মহাযোগী নর ও নারায়ণের অঙ্গীকারবদ্ধ অবস্থান।

"এটাই কি মহাপ্রস্থানের পথ ?" সুরমাদির কৌতুহল।

"সবাই তো তাই বলে। কিন্তু পণ্ডিতদের অন্য মতও আছে। তাঁদের মতে ব্যাসদেবের যে আশ্রম ছিল বদরিকাশ্রমে, তা কাশ্মীরের অন্তর্গত। সেখানেও বদরী-নারায়ণ নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। যুধিষ্ঠির সেই পথেই যান মহাপ্রস্থানে।"—চলতে চলতে উত্তর দিই।

—তাহলে ?

—কত জায়গায় কত কিংবদন্তী। কোথায় যে কী ছিল বোঝা মুশকিল। ভেবে নিন, যাঁরা এ পথকেই মহাপ্রস্থানের পথ বলেছেন, তাঁরাই ঠিক।

বিষ্ণুমন্দির বদ্রীনাথ। নারদকুণ্ড হতে উদ্ধার করে বদ্রীনারায়ণকে জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠা করেন। শাশ্বত ভারতের আদিকাল থেকে পরম শ্রদ্ধার তীর্থস্থান বদ্রীনাথ। অলকানন্দার তীরে নরনারায়ণ পর্ব্বত। তারই মাঝে নানা রঙে রঞ্জিত সুন্দরতম মন্দির বদ্রীনাথ। পিছনে তুষারশুভ্র নীলকণ্ঠ (২১,৬৪০ ফুট)।

মূল মন্দিরকে ঘিরে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তি। লম্বা হলঘরে কীর্ত্তনের আসর। মন্দির কমিটির গদী, যেখান থেকে বিভিন্ন রেটের ভোগ ব্যবস্থা করা হয়। মন্দিরের ভিতরও অশেষ জাঁকজমক। পুলিস মোতায়েন রয়েছে সম্পত্তি পাহারায়। ঝলমলে পোষাকে রাওল পূজা করছেন। ভীড় উপছে পড়ছে। সন্ধ্যারতির পরেই শহর স্তব্ধ।

অক্টোবরের শেষ। শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ। লেপের নিচেও ঘুম আসে না। নিমাইদা কাতরাচ্ছেন। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। বমি ভাব। ওষুধ চাইছেন। বাসে আসার সময় অসুস্থা বৌদিকে ওষুধ খেতে দেন নি। হোমিওপ্যাথিতে অগাধ বিশ্বাস। তাই জিজ্ঞেস করি, "এলোপ্যাথি ওষুধ খাবেন কি ?"

—হ্যাঁ। তাই দ্যাও।

—বৌদিকে যে তখন খেতে দিলেন না ?

—ও সব পরে হবে। আগে তো বাঁচি।

তাই তো। নিজে বাঁচার জন্য সব করা যায়। অন্যের জন্য নীতি।

ওষুধ দিতেই হয়। যদিও জানি, এটা নিচে না নামা পর্য্যন্ত সারবে না। উচ্চতায় অনেকেরই অমন হয়।

ভোর হতেই বেরিয়ে পড়লাম বসুধারার পথে। বদ্রীনাথ থেকে আট কিলোমিটার হাঁটতে হবে। মন্দিরের সামনের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। ডান পাশে অলকানন্দা। পথ জানি না। দেখি, এক সন্ন্যাসিনী।

"মা-জী, বসুধারা কি এই পথেই যাব ?"—জানতে চাই।

—এই রাস্তা। মানা থেকে বাঁদিকে চলে গেছে শতপন্থের পথ। তোমরা পুল পার হয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরে যাও।

—শতপন্থ যাওয়া যাবে ?

—নিশ্চয়। তবে সঙ্গে খাবার ও জ্বালানী নিতে হবে। বড় সুন্দর জায়গা। থাকার জন্য পথে গুহাও পাবে।

চলতে থাকি। তিন কিলোমিটার পর ঝুলা পুল পার হচ্ছি। নিচে উত্তর দিক থেকে আসা সরস্বতী ও পশ্চিম থেকে পূবে বহমান অলকানন্দার সঙ্গম। পার হয়েই দেখি ভারত সীমান্তের শেষ গ্রাম "মানা" (৩৪০০ মিটার)। ছবির মতো সুন্দর। বাড়িগুলি পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরী। উপরে শ্লেট পাথর। বেশির ভাগই দোতলা। নিচে থাকে গরু-ভেড়া, উপরে নিজেরা। পরিচ্ছন্ন উঠোন। বেঁটে খাটো, ফরসা রঙ, সুন্দরী মেয়েরা কম্বলের তৈরী পোষাক পরে কাজ করছে। শিশুরা কেউ খেলছে, কেউ পড়ছে। এরা মার্‌চা ভুটিয়া। তিব্বত থেকে যে তিনটি দল কয়েক শ' বছর আগে চলে এসেছিল, তাদেরই একটি দল থেকে যায় মানা ও নিতি উপত্যকায় যা 'বিষ্ণুগঙ্গা উপত্যকা' বলে পরিচিত। প্রাচীনকালে তিব্বত ও ভারতের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হতো মানা পাস (৬০০০ মিটার)। একদিন সেই পথ বন্ধ হয়ে গেল। মার্‌চা ভুটিয়ারা থেকে গেল এখানে। চাষবাস করে। ভেড়া নিয়ে যায় দূর দূরান্তে সবুজ তৃণক্ষেত্রে (বুগিয়ালে)। অবসর সময় কাটায় নাচে গানে। এদেরই বলা হতো গন্ধর্ব।

গ্রাম শেষ হতেই ভারত-তিব্বত সীমান্ত প্রহরীর বাধা। জেনে নেয় সঙ্গে ক্যামেরা আছে কিনা। বসুধারায় ক্যামেরা নেবার অনুমতি নেই। সামনে পাহাড় ডিঙিয়েই যে তিব্বত। চীনের এক্তিয়ারভুক্ত।

কিছুটা পথ গিয়েই থমকে দাঁড়াই। ছড়ানো ছিটানো ছোট-বড় পাথরের উপর দিয়ে প্রবল গর্জনে নেমে আসছে সরস্বতী নদী। তারই উপর একখানা বিশাল আকারের শিলা। পাথরখানাই পুলের কাজ করছে। নাম ভীমপুল।

"ভীম আবার এখানে কি করলো বল তো?"—অনিলের প্রশ্নে ফিরে তাকাই।

—এই পথে পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থানে যাচ্ছে। নদী পার হবে কি করে? ভীমসেন এদিক ওদিক থেকে বড় বড় পাথর টেনে এনে এই চলার পথ তৈরী করে দেন। আমরা তাই চলতে পারছি।

ভীমপুল পার হয়ে এগিয়ে চলেছি। পাথর বিছানো চড়াইর পথ। এক পাশে পাহাড়ের দেওয়াল। আর একদিকে খাদ। পাহাড়ের গায়ে, পথের ধারে এখানে ওখানে কিছু ফুল ফুটে রয়েছে। এখন বেশি নেই। জুন-জুলাইতে নাকি প্রচুর ফুল দেখা যায়। কত জাতের-বেগুনী রঙের নাগকেশর, লাল ও হলুদ প্রিমূলা, হিমালয়ান পপি। এখন দেখছি কিছু ছোট ছোট ঝোপ। এ পথে বড় গাছ নেই। হাওয়ার প্রবল দাপট। মনে হয়, রাস্তা থেকে ফেলে দেবে। ঠাণ্ডায় হাতের গ্লাভস্ খোলার উপায় নেই। পথ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। তৃষ্ণায় গলা, জিভ, ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে। দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। কঠিন চড়াইর শেষে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

বসুধারা। উঁচু পাহাড়ের (প্রায় ৫০০´) উপর থেকে প্রশস্ত জলপ্রপাত লাফিয়ে পড়ছে। মাঝ পথেই সেই জল জমাট হয়ে যখন নিচে পড়ছে, তখন বরফ। পড়ছে এক শিলাখণ্ডর উপর। ব্যাস শিলা। প্রবাদ, এই শিলাতে বসেই বেদব্যাস রচনা করেন মহাভারত। অষ্ট বসুর তপস্যাস্থল বসুধারা। এই জলধারা নিচে অলকানন্দায় পড়বার

কথা। কিন্তু এখন যে বরফ। আমাদের পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে বরফের স্তূপ। এখান থেকে চোখ যে দিকেই ফেরাই, নতুন নতুন দৃশ্যের সাজি সাজানো রয়েছে। কত যে অনামী পর্বত! গভীর খাদ। উচ্চতম জলপ্রপাত। বরফের অবরোধ। বিমূঢ়।

"তুমলোগ ইতনা সুবে চলা আয়া?"—তাকিয়ে দেখি তিন নবীন সন্ন্যাসী। পরনে সাদা ধুতি ও উত্তরীয়। নগ্ন পা। প্রাণবন্ত আনন্দ-উজ্জ্বল মুখশ্রী। হিমবাহের পাশে বসে সমস্বরে স্তোত্রপাঠ করে পাহাড়ের গা বেয়ে ব্যাসশিলাকে প্রদক্ষিণ করে এগিয়ে গেলেন। ওদিক দিয়ে পথ আছে নাকি? আমরা তো পথ না পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি।

"চল্ তো। ওঁদের পিছু পিছু যাই।"—পরমানন্দ বলে।

ওঁদের মতো স্বচ্ছন্দ গতি আমরা পাব কোথায়? প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে, পাথর আঁকড়ে, হোঁচট খেয়ে পিছু নিলাম। আবার বিস্ময়!!

সামান্য দূরত্ব রেখে পাশাপাশি দুটো বরফস্তূপ। ওভাল শেপ। ঢালুর উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভিতর ফাঁপা। স্তূপের ভিতরের ছাদের থেকে টুপ্ টুপ্ করে বরফজল চুঁইয়ে পড়ছে। ভিতরের ঐ অংশ যেন মিনিয়েচার করা। তারই সামনে ঐ তিন সাধক আগের মতোই স্তব করছেন। এ যেন এক অপার্থিব জগতে চলে এসেছি।

সাধকরা ফিরে যাচ্ছেন। প্রচণ্ড শীতে গলা, বুক, ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। বরফ তুলেই মুখে দিচ্ছি। বন্ধু সাবধান করে দিচ্ছে, "খাস্ না। পাহাড়ি ডাইরিয়া হলে রক্ষে নেই।"

—সে তো পরে হবে। এখন তো বাঁচি।

ঠাণ্ডায় বেশিক্ষণ থাকার উপায় নেই। কৃতজ্ঞতা জানাই তিন সাধককে। ওঁরা না এলে এমন সৌন্দর্য্য যে চোখের সামনেই আড়াল হয়ে আছে জানতেও পেতাম না। এই সৌন্দর্য্যের রেশ ধরে ফিরে চলি।

"এস ছেলেরা। আমি তখন থেকে তোমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছি।" —আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সেই সকালে দেখা সন্ন্যাসিনী। আমরা দাঁড়াই। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। কী ধান্দা বাবা! কিছুর পাল্লায়

আবার পড়ব না তো ?

সন্ন্যাসিনীর মুখে এক টুকরো হাসির আভাস। বলেন, "কুছ সোচ মৎ। আও, অন্দর আও।"

পথপাশে এক ছোট্ট কুঠিয়া। বদ্রীনাথ মন্দির কমিটি থেকে বরাদ্দ করা সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য। তিনজন তো আছি। দেখাই যাক না ভিতরে গিয়ে।

পাহাড়ের গায়ে গুহা। তাকে ঘিরে দেয়াল দিয়ে ঘর বানানো হয়েছে। বেদীর উপর দেব-দেবীর ফটো, ত্রিশূল ও চিম্‌টা। গেরুয়া-বসনা, জটাধারিনী, কপালে ভস্মমাখা, সিঁথিতে প্রশস্ত সিঁদুর। সন্ন্যাসিনীর বয়স আন্দাজ করতে পারি না। পঞ্চাশোর্ধ নিশ্চয়ই। কিন্তু কতটা ? সতেজ বলিষ্ঠ চেহারায় বুঝবার কোন উপায় নেই।

কিছু বাগাবার ফিকির নয় তো ? মনে সন্দেহ জাগে।

"সারাদিন বড় কষ্টে পথ চলেছ। তাই বাবা ছটফট করছি। তোমরা বস। আমি একটু চা বানাই।" সন্ন্যাসিনী বলেন।

এ সাধিকার ভাষা, না গৃহস্থির ! চায়েরও ব্যবস্থা আছে ? কিছু মিশিয়ে দিলেই তো গেছি। বলি, "না, না। কিছুর দরকার নেই।"

—সন্দেহ হচ্ছে ? আমি তোমাদের সামনে বসেই বানাচ্ছি।

—আপনি কেন কষ্ট করবেন ?

—এক জন সিধা পাঠিয়েছে। এ তো আমার পড়েই থাকবে।

সন্দিহান মনের জন্য বড় লজ্জা পাই। মাতৃস্নেহে সন্তানের অবিশ্বাস।

ষ্টোভে একটা বাটিতে চা-জল-দুধ ফুটলে না ছেঁকেই মগে ও বাটিতে পরিবেশন হলো। চায়ের আসর বলে কথা। গল্প তো জমবেই। সন্ন্যাসিনীর আশ্রম আছে কাশীতে। ঠিকানা দিলেন না। বললেন, "আবার তো বদ্রীতেই দেখা হবে। একবার শতপন্থ দেখে এসো।"

—হবে যাওয়া ?

—কিঁউ নেহি ? এখন গিয়ে উষ্ণকুণ্ডে স্নান করে নাও। সন্ধ্যাতে

বদ্রীনাথের পূজা দেখো। শয়ানের আগে ফুলের সাজ খুলে রাখা হয়। বদ্রীনাথের মালা নিও।

—ভীষণ ভীড় যে?

—তাতে কি? যারা বেশি টাকা দেয়, তারা সামনে থাকে। এই তো? তোমরা দূর থেকেই দেখবে। দেবতা তো সবাইকেই দেখেন। আমিও থাকব মন্দিরে।

যাব তো নিশ্চয়ই। এ কেমন সাধিকা দেখতে হবে না? মনের দ্বন্দ্বের নিরসন তো চাই।

—তোমরা আর কোথায় যাবে বাবা?

—এখান থেকে কাল যাব হেমকুণ্ড।

—তার কী দরকার? চার ধাম তো ভগবানের চার অঙ্গ। দু'বাহু তাঁর গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী, হৃদয়ে কেদারনাথ আর মস্তকে বদ্রীনারায়ণ। এখানেই তিন রাত থেকে যাও।

আমরা কিছু প্রণামী দিতে চাই। নিলেন না। বেদীতে কিছু দিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে আসি।

সন্ধ্যারতি দেখতে গেছি। প্রধান পুরোহিতের পরেই সন্ন্যাসীর দল দাঁড়িয়ে সমস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। শুনেছি, সাধনমার্গের শ্রেণী বিচারে সাধু সন্তদেরও দেবমূর্তি থেকে দূরত্ব নির্দ্ধারিত হয়। তার পিছনেই রয়েছে আর এক সারি সাধু। তারও পিছনে আর এক সারি। সন্ন্যাসিনী প্রথম সারিতেই দাঁড়িয়ে। হাতে জপের মালা। কণ্ঠে একই সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ। ভীড় হলেও আজ বদ্রীনাথকে বড় ভাল লাগছে। কখন যে বিভোর হয়ে গেছি টের পাই নি। একজন পুরোহিত এসে হাতে দিয়ে গেলেন একটি ফুলের মালা। এবার মন্দির বন্ধ হবে।

বাইরে বেরিয়ে খুঁজি সন্ন্যাসিনী মাঈজীকে। দেখি, মূল মন্দিরের বাইরে একমনে হাতে জপের মালা ঘুরছে। অধর নড়ছে। চোখে যেন কিসের এক ঘোর লেগে রয়েছে। আমরা সামনে দাঁড়াই। চিনলেন বলেও মনে হলো না। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসি।

ঘরে ফিরেই নিমাইদার ধমকানি শুনতে পাই, "তখন থেকে বলছি, বাইরে দাঁড়িও না। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।" উত্তরে বউদির কণ্ঠস্বর কানে আসে, "ছেলেগুলো সারাদিন বাইরে কাটিয়েছে। রাত হয়ে গেল। ওদের ঠাণ্ডা লাগবে না?"

—লাগুক গে। তুমি শুয়ে পড়।

"ওরা মন্দিরে গেল। আমাদের আর রাতের পুজো দেখা হলো না।"—সুরমাদি আক্ষেপ করেন।

—নতুন কী দেখার আছে? যত্তো সব।

অগত্যা বৌদিরা চুপ করে যান। আমরা ঘরে ঢুকি। বৌদি ও সুরমাদি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। কী যেন একটা কিছু ঘটে গেছে এটুকু বুঝতে পারেন। নিমাইদার ভয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পান না। অধৈর্য্য নিমাইদাই জিজ্ঞেস করেন, "এতক্ষণ মন্দিরে কি করছিলে?"

খুলে বলি মন্দিরে পূজারতির কথা, সন্ন্যাসিনীর কথা। বৌদি ও সুরমাদি আগ্রহভরে শোনেন। আফশোষ করেন, "এত কষ্ট করে এতদূর এসে কাছে পেয়েও দেখা হলো না।"

"তোমরা আগে বললে না?"—নিমাইদার অভিযোগ।

—আগে তো জানতাম না। ঘরে বসে থাকলে দেখবেন কি করে? বৌদিদেরও তো মন্দিরে যেতে দিলেন না।

—ওরা থাকতো। আমি যেতাম। কিছু পেলে?

—কী পাবার কথা বলছেন?

—সে তোমরা বুঝবে না। আমি থাকলে দেখতে। সারা জীবনের মতো ভাগ্য ফিরিয়ে নিতাম।

"উনি বোধহয় তেমন কেউ নন"—আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ি।

পরদিন। তখনও সূর্যের আলো ফোটে নি। চলেছি বাস ধরতে। গোবিন্দঘাটের টিকিট কাটা হলোনা। কণ্ডাক্টার জানালো, হেমকুণ্ডের

পথ বরফের জন্য আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব ঋষিকেশের টিকিটই কাটতে হলো। বাস ছাড়ছে। পিছন ফিরে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছি বদ্রীনাথ মন্দিরকে। চালচিত্রের মতো শুভ্র-শিখর নীলকণ্ঠকে।

হঠাৎ মনে বিদ্যুৎ চমক। কাল সন্ন্যাসিনী কেন বললেন, "লোকপাল যাবার কী দরকার ?" তিনি কি তাহলে আগেই জানতেন যে আমাদের যাওয়া হবে না !

—০—

—কেদারনাথ-ত্রিযুগীনারায়ণ-বদ্রীনাথ-বসুধারার যাত্রাপথ—
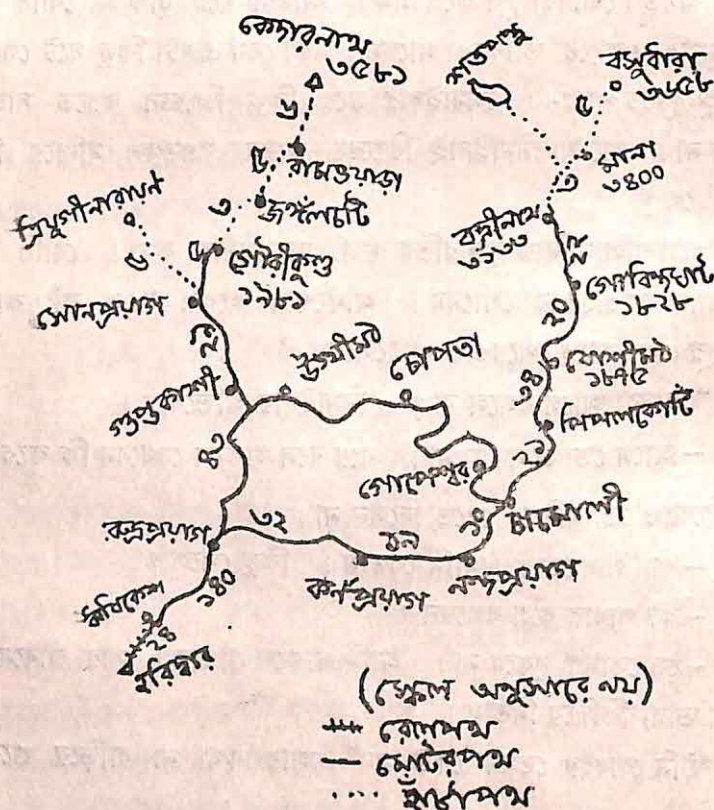
সুন্দরডুঙ্গা—পিণ্ডারী হিমবাহ

ও কলকল করে হেসে বলে, "কী দেখছ?"

ফিসফিসিয়ে বলি, "সঙ্গম"।

—ভাল লাগছে?

—উঁ-উঁ।

—বেশরম।

সাথী আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। বলে, "শুনছ?"

—উহুঁ।

—দেখতে পাচ্ছ?

—চুপ।

মধ্যরাতের আলো-আঁধারিতে উথাল-পাথাল। নিঃশব্দ পৃথিবীর বুকে গর্জনের মত আলোড়ন। হঠাৎ হঠাৎ ঝিকিমিকি। ওর হাসির দমক বেড়ে যায়। ইশারায় বলে, "আসবে আমার কাছে?"

সাথীর হাত সরিয়ে দিই। তাকাই। বলি, "যাব?"

—খুব ইচ্ছে?

—দারুণ।

—কিন্তু ওতো এখনই শেষ হয়ে যাবে।

ওর কলহাস্য। হাতছানি দেয়। বলে, "আমি শেষ হই না। এ আমার অভিসার। আমায় অনুসরণ কর। আমি সবার জন্য। তোমারও। এস।"

চমক লাগে। রাত শেষ হয়ে আসছে। এখুনি সাথীকে নিয়ে লুকিয়েই চলে যাব। ওর আকর্ষণ বড় তীব্র। কে ও? জিজ্ঞেস করেই ফেলি, "কে তুমি?"

—পিণ্ডার গঙ্গা। দেখলে না, এখানে আমার অভিসার অলকানন্দার সঙ্গে। এর কাছেই যে আমার আত্মাহুতি।

—তুমি কোথা থেকে এলে? কোন পথে?

—কুমায়ুন থেকে। পথ বলব না। খুঁজে নিও। আসবে? দেখব, কেমন ভালবাস। এস কিন্তু।

কর্ণপ্রয়াগের সঙ্গমে বসে রাত কেটে গেল। সাথী যেন কথা হারিয়ে ফেলেছে। শুধু বলতে পারে, "যাবে?"

চোখের মায়াঞ্জন তখনও মোছেনি। বলেছিলাম, "দেখি।"

তারপর দু'বছর কেটে গেছে। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী-গোমুখ, কেদারনাথ দেখে মন্দির বন্ধ হবার দু'দিন আগে এসেছি বদ্রীনাথে। শহর প্রায় পরিত্যক্ত। বাসিন্দারা সবাই নিচে নেমে গেছে। মাত্র কয়েকজন যাত্রীর চলাফেরা। হঠাৎ আলাপ মিঃ কুণ্ডুর সঙ্গে। সরকারি ইঞ্জিনীয়ার। পরিবারের সঙ্গে বৃদ্ধা মা'কেও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ভাল লাগল। আজকাল কেই বা মা-বাবার বাড়তি বোঝা বয়? মিঃ কুণ্ডু হাতে এক টুকরো কাগজ ধরিয়ে দিলেন। মোটামুটি একটি ছক। বললেন, "আমরা পিণ্ডারী-কাফনী গিয়েছিলাম। সুন্দরডুঙ্গা যেতে পারি নি। যা দেখছি, আপনারা নিশ্চয়ই পারবেন।"

পিণ্ডারী! সেই অভিসারিকা? সাথীর দিকে তাকাই। ওর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। মিঃ কুণ্ডু কোন জায়গার বর্ণনা বা পথের নির্দ্দেশ দিলেন না। আমরাও কিছু জানতে চাই নি। আবার হিমালয়ে আসব কি না তারই ঠিক নেই। জেনে কি হবে? হঠাৎ ওর মোহিনী রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কানে বাজে ওর আবেদন, "পথ খুঁজে নিও। এস কিন্তু।"

ফিরে এসে যে যার কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত। দৈনন্দিন নগরসভ্যতায় ক্লান্ত

মন। মুক্তি চায় বন্ধন থেকে। মন চায় যেখানে হোক বেরিয়ে পড়ি। হঠাৎই পরমানন্দ হাজির। বলে, "টিকিট কাটা হয়ে গেছে। সুন্দরডুঙ্গা-পিণ্ডারী যাব। তৈরী থাকিস।"

—পথের খবর নিয়েছিস?

—পিণ্ডারীর পথে থাকার জায়গা পাব।

—সুন্দরডুঙ্গায়?

—জানি না।

—তাঁবু তো নেই। রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে?

—গুহা বা মেষপালকদের ঘরও কি পাব না?

হিমালয়ের পথ অনিশ্চিত জানি। কিন্তু কোন কিছু খবর না নিয়ে যাওয়া যুক্তিবাদী মন মেনে নিতে চায় না। তবুও যেতেই হবে? পরমানন্দ নিশ্চিত প্রত্যয়ের স্বরে বলে, "একটা কিছু পেয়ে যাব ঠিকই। নাহলে পিণ্ডারী-কাফনী দেখে ফেরার পথে বৈজনাথ, কৌসানী, আলমোড়া রাণীক্ষেত, নৈনিতাল তো দেখছিই। এতও কি যথেষ্ট নয়?"

মন যাযাবর। কেউ ঘরে বসেও মনকে বেড়িয়ে আনে কত জানা-অজানা জায়গা থেকে। কেউ ছুটে যায় অজানার সন্ধানে। আবিষ্কার করে নতুনকে। আমরা কিছু জানাকে আর একটু জানতে চাই। উপলব্ধি করতে চাই নিজের মত করে। উপভোগ করি বৈচিত্র্যকে। নিজেদের সামান্যতাকে বুঝতে চাই অসামান্য মহিমার কাছে গিয়ে। এই যাযাবর মনকে নিয়েই যত সমস্যা। নিশ্চিতকে অনিশ্চয়তায় নিয়ে যাওয়াতেই যত আনন্দ। তাই বেশি না ভেবে এই আনন্দসাগরে মাঝে মধ্যেই ডুব দিই।

১৯৮৬র ৩রা অক্টোবর। অমৃতসর মেল ধরে চলেছি লক্ষ্ণৌর দিকে। গাড়ি ছুটে চলেছে মাঠ-প্রান্তর পেরিয়ে। নামী-অনামী স্থান ছাড়িয়ে। দিনের কোলাহলে আমাদের আলোচনা ক্রমে তর্কের রূপ নিল। প্রথমে কোথায়? সুন্দরডুঙ্গা, না পিণ্ডারী? যুক্তি, প্রথমেই যদি সুন্দরডুঙ্গায় ব্যর্থ হই তাহলে পরবর্ত্তী ভ্রমণে তার প্রভাব পড়বে। পিণ্ডারী যেতে

সবাই আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। পিণ্ডারী গিয়ে চলায় অভ্যস্ত হলে সুন্দরডুঙ্গায় অসুবিধা হবে না। অপরদিকের যুক্তি, প্রথমেই কঠিন পথকে অতিক্রম করা। পিণ্ডারী গিয়ে ক্লান্ত হবার পর সুন্দরডুঙ্গার মত দুর্গম ও অনিশ্চিত যাত্রা শরীর ও মনের দিক থেকে অসম্ভব হয়ে উঠবে। মতান্তর মনান্তরে পৌঁছয়নি। সিদ্ধান্ত হয়, ভাড়ারি গিয়ে গাইড ও স্থানীয় লোকের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে নেওয়া যাবে।

বিকেল সাড়ে চারটেয় লক্ষ্ণৌ পৌঁছে রাত পৌনে দশটার নৈনিতাল এক্সপ্রেসের জন্য অপেক্ষা। কতক্ষণই বা সময়? এই সময়টুকু হোটেলে না গিয়ে স্টেশনেই কাটান যাক। পরিচ্ছন্ন বাথরুম, পর্য্যাপ্ত জল, সুন্দর বিশ্রাম ব্যবস্থা। সস্তায় ক্যান্টিনের খাবারও বেশ ভাল।

নৈনিতাল এক্সপ্রেসে পুরো রাতটি ঘুমিয়ে নিয়ে সকাল হতেই আলাদা অনুভূতি। হিমেল হাওয়া। প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপসজ্জা। শেষ স্টেশন যদিও কাঠগোদাম, কিন্তু যাত্রাপথের সব বাসই আগের স্টেশন হলদোয়ানী থেকে ছাড়ে। তাই ওখানেই নেমে পড়লাম। পরিচ্ছন্ন স্টেশন। চোখের সামনে পাহাড়ের সীমারেখা। প্রথম দর্শনেই ভাল লাগে। হিমালয়ের অঙ্গনে পা দিলাম মনে হয়।

নেমেই ছোটাছুটি। বাস কই? গাড়ি আজ অনেক দেরিতে পেঁ ৗছেছে। প্রায় সাড়ে এগারটা। বাগেশ্বর যাবার বাস অনেক আগেই ছেড়ে গেছে। সুতরাং বিভ্রাট। যাত্রীদের দাবি, এক্ষুনি বাস দিতে হবে। ট্রেন লেট করেছে তার জন্য কি যাত্রীরা দায়ী? বাস কর্তৃপক্ষ রাজি নয়। কারণ, যাত্রী কম। কি করা যায়? থাকি কোথায়? হোটেল আছে। আছে ধর্মশালাও। কোনটাই ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। তাছাড়াও চিন্তা রয়েছে—যদি বাস ছাড়ে?

"এখন কেন যাবে?" প্রশ্ন শুনে তাকিয়ে দেখি পাশে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বলেন, "বাস ছাড়লেও পৌছতে রাত হবে। কাছেই মন্দির। তোমাদের ভাল লাগবে। ওরা থাকারও ব্যবস্থা করে দেবে। কাল সকালের বাস ধরে চলে যেও।"

ভাল প্রস্তাব। গরমের থেকে এসে পাহাড়ি পথের আবহাওয়ায় একটু অভ্যস্ত হয়ে যাওয়াই উচিত। কিন্তু পথ হাতছানি দেয়। থামতে দেয় না। কতক্ষণে পৌঁছুব এই চিন্তাই তাড়িয়ে বেড়ায়। তাই যখন বাস কর্তৃপক্ষ বাস ছাড়তে রাজি হল, একটুও দ্বিধা না করে উঠে পড়লাম। বেলা একটায় বাস ছাড়ল।

বাস চলেছে দ্রুতগতিতে। হিমালয়ের পথে সাধারণত রাতে বাস চলে না। উচিতও নয়। হলদোয়ানী থেকে বাগেশ্বর যেতে ১৮০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে। দ্রুত না চলে উপায়ই বা কী? "ধীরে চালাও, সাবধানে চালাও, সামনে বিপজ্জনক মোড়, হর্ণ দাও, প্রথমে নিরাপত্তা তারপর গতি" সব খোদিত সতর্কবাণী উপেক্ষা করে বাস ছুটে চলেছে। আমরাও ছুটছি। মনে মনে।

হঠাৎ ধাক্কা। না, বাস নয়। মন। মালপত্র? সব তো বাসের মাথায়। কেউ যদি নিয়ে নেয়? ভুল করে অনেকের টাকাও রয়ে গেছে হ্যাভারস্যাকের মধ্যে। বীরু কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞেসই করে ফেলে, "সামান ঠিক রহেগা তো?" কণ্ডাক্টর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এমন আশ্চর্য্য প্রশ্ন যেন জীবনে শোনে নি। পিছনে বসা ভদ্রলোক মিটিমিটি হাসছেন। রাগ ধরে যায়। এতে হাসবার কী আছে? আমাদের মনের অবস্থা বুঝে ভদ্রলোক বলেন, "বেফিকর রহ সাব্। ইধার কই দুসরেকা সামান নেহি লেতা। ইয়ে শেহের নেহি হ্যায়।" তবু মন থেকে দ্বিধা যেতে চায় না। কিন্তু নিরুপায়। তাই পথের দৃশ্য দেখতেই মন দিই।

একে একে ছেড়ে যাচ্ছি গরমপাণি, আলমোড়া। তপন নিবিষ্ট মনে দেখছে। এবারই প্রথম এসেছে। এর আগে পাহাড় দেখে নি। সব কিছুতেই ওর বিস্ময়। পথের কোনও কোনও বাঁকে হঠাৎ হঠাৎ দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের বরফচূড়া। নতুন দেখছে। ঠিক বুঝতে পারছে না। তাই সরল প্রশ্ন, "ও কী?"

"চূণা কা পাহাড়।"—সত্যেনের গম্ভীর উত্তর।

হাসবার উপায় নেই।

কৌসানী যাবার আগেই দেখলাম, সকালে ছেড়ে আসা বাস রাস্তায় খারাপ হয়ে পড়ে আছে। দুই বাসের যাত্রী নিয়ে এবার বাস ভিন্নপথ ধরল। পথ সংক্ষেপ করার জন্য। যারা স্থানীয় যাত্রী তারা একটু অসন্তুষ্ট হল। অকারণে তাদের অনেককেই অন্য কোথাও রাত্রিবাস করতে হবে এবং পরের দিন ফিরতে হবে নিজের নিজের গন্তব্যস্থলে। তবু কেউ প্রতিবাদ করে না। ভাবলাম, এমন ঘটনা যদি আমাদের সমতলে হত ?

বেশ শীত শীত করছে এখন। হঠাৎ এই ঠাণ্ডায় সবাই সোয়েটার খুঁজছি। চাদর খুঁজছি। অনেকেই পাচ্ছে না। পাবে কি করে ? সব তো বড় ব্যাগে। সেই ব্যাগ বাসের মাথায়। একটু আগেও গরম ছিল, তাই কাছে রাখার দরকার মনে করে নি। এবার ভোগান্তি। প্রয়োজনের সময় কাছে পাচ্ছে না। ঠাণ্ডা হবেই বা না কেন ? ৬২০০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছে গেছি। এসেছি কৌসানী। গান্ধীজীর ভারতের সুইজারল্যাণ্ড। তিন শ' কিলোমিটার বিস্তৃত হিমালয়ের বিভিন্ন শিখরগুলি যেন রুপোর পাতে মোড়া। উদিত সূর্যের আলোয় তা সোনা হয়ে যায়। দৈত্য নেই—দানো নেই ; তবু কে যেন ঘুম পাড়ানিয়া গানে শান্ত করে রেখেছে কৌসানীকে। শুধু দীর্ঘ সারিবদ্ধ পাইন গাছের ঝালর দেওয়া পাতার ঝিরঝিরে হাওয়ার ফিসফিসানী। আর সব নিঝুম।

"কেমন লাগছে ?"—সাথী কানে কানে বলে।

—অদ্ভুত সুন্দর।

—ওর থেকেও ?

—কী করে বুঝব ?

—বাঃ। অত করে দেখলে যে !

—সে তো রাতের অন্ধকারের আলোতে। দিনে দেখি।

বাগেশ্বর পেঁছিতে রাত ন'টা। পাহাড়ি শহরে এত রাতে প্রায়

সব দোকানই বন্ধ। ভাল হোটেলে বা বাংলোতে জায়গা নেই। কাঠের হোটেলে জায়গা পাওয়া গেল। কোন শৌচাগারও নেই। এত রাতে খাবারই বা পাব কোথায় ? অনেক অনুরোধে এক দোকান-দার পুরী-তরকারি বানিয়ে দিল। বিদেশে এত রাতে খাবার ও আশ্রয় পাওয়া গেল। আরাম নাই বা হল ? এরপর যে আশ্রয়েরও নিশ্চয়তা নেই।

ভোর হল। ধীর গতিতে বয়ে চলেছে সরযূ ও গোমতী নদী। উচ্ছলতা বড় বেমানান। তারই তীরে প্রসিদ্ধ শিবস্থান বাগেশ্বর। বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঝিলমিল করছে। দূরে বরফশিখর পঞ্চচুল্লীর মাথায় দ্রৌপদীর উনুনের গনগনে আগুনের লাল আভা। বাস ছাড়বে সকাল সাতটায়। ২২ কিলোমিটার পথ গেলেই ভাড়ারি। আমাদের হাঁটাপথের প্রবেশদ্বার।

ছোট্ট জনপদ ভাড়ারি। পাশে বয়ে চলেছে সরযূ নদী। এখানে ভারী সুন্দরী। তাই পথ আগলে রেখেছে বিশাল পাথরগুলি। কাঁচ-পোকা রঙের তন্বী সরযূ ওদের গ্রাহ্যই করছেনা। ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ওদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কাউকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে। কাউকে পাশ কাটিয়ে ঠেলে চলে যাচ্ছে। হতাশ পাথরখণ্ডর গায়ে দাগ রেখে যাচ্ছে। নির্মেঘ আকাশের নিচে সবুজ চীর ও ওয়ালনাট গাছের উপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে বরফে ঢাকা গিরিশিখর।

"বড় সুন্দর, না ?"—মুগ্ধ সাথীর মৃদু উচ্ছ্বাস।

—তোমার থেকেও ?

বাস দাঁড়িয়ে পড়েছে। চারপাশ থেকে লোকে ঘিরে ধরল। আজ আমরাই নতুন যাত্রী। তাই কৌতুহল—কোথায় যাব, কতজনের দল, গাইড-কুলি ঠিক করা আছে কিনা। একজনের সঙ্গে কথা বললে অন্যরা বিরক্ত করছে না। হঠাৎ মনে পড়ল, কার লেখায় যেন অমর রামের কথা পড়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "অমর রাম কৌন হ্যায় ?" ভীড়ের পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটি এগিয়ে এসে 'নমস্তে'

জানাল। মুহূর্তে সবাই পথ ছেড়ে দিল। অমর রামের সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক কোন নির্দ্দেশ ছাড়াই আমাদের মালপত্র দোতলার একটি ঘরে নিয়ে তুলল। আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিল। যেন ওর সাথে কথা পাকা হয়েই গেছে।

পরমানন্দ জানতে চায়, "সুন্দরডুঙ্গা যাওয়া যাবে? পথ ঠিক আছে? থাকার জায়গা আছে? আমাদের কিন্তু তাঁবু নেই। প্রথমে পিণ্ডারী যাবে তো?"

"একটু দম নে। এত প্রশ্ন মনে থাকে?"—ব'লে অমর রামের দিকে তাকাই।

অমর রাম হাসছে। বলে, "আমি কালই সুন্দরডুঙ্গা থেকে একদল যাত্রী ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছি। পথ বিলকুল ঠিক আছে। ঝুপড়িও পেয়ে যাব। কোন অসুবিধা নেই। প্রথমে সুন্দরডুঙ্গা যাওয়াই ঠিক হবে।"

উত্তর শুনেই পরমানন্দর গর্বিত হাসি। ভাবখানা, "দেখলি তো। বলেছিলাম, কোন অসুবিধা হবে না।"

গাইড ও কুলির রেট ঠিক হল যথাক্রমে পঁয়ত্রিশ ও পঁচিশ টাকা। পড়াও হিসাবে সুন্দরডুঙ্গার জন্য। মোটামুটি ১০/১২ মাইলের পর এক পড়াওর হিসাব হয়। আর পিণ্ডারীর জন্য রেট মাইল প্রতি তিন ও আড়াই টাকা। খাওয়া আমরা দেব।

আমাদের আর্থিক অবস্থা দরাজ হবার মত নয়। পোর্টার কতজন লাগবে? অমর রাম আমাদের মালপত্র দেখে নেয়। কিছু জিনিস ভাড়ারিতেই রেখে যাবে সিদ্ধান্ত হয়। তবুও পাঁচজন পোর্টার লাগবে। গাইড তো আছেই। এ তো অনেক টাকার ধাক্কা। লোক কমাতে বলি। বোঝাই আমাদের পকেটের অবস্থা। সব শুনে অমর রাম বলে, "এর কমে তো হবে না। অসুবিধা হলে আমার টাকা এখন দেবেন না। ফিরে গিয়ে পাঠাবেন।"

সুতরাং মেনে নিতেই হল। রেট ও পোর্টার সংখ্যা ঠিক হল।

অমর রাম খুশি। কিন্তু নিশ্চিন্ত নয় কেন? লোকজনের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওদের ভাষায় সবাইকে কী যেন বোঝাতে চাইছে। বুঝলাম সমস্যা। এত লোকের মধ্য থেকে কোন পাঁচজনকে পোর্টার হিসেবে নেবে? সবাই তো পরিচিত। আমরা বেড়াতে যাবার দল বাছতেই হিমসিম খাই, এ তো রুজি-রোজগারের প্রশ্ন। দায়িত্ব তো আছেই। তবু ঠিক হয়। ওরা আসে। দ্বিধাজড়িত হাসি। শঙ্কা, আমরা ওদের পছন্দ যদি না করি? না করার কোন কারণ নেই। দায়িত্ব তো গাইড অমর রামের। আমাদের কি? অমর রামও বলে তাই, "ফেরার বাসে উঠিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব আমাদের। তুমলোগ মজে মে চলো।"

মজা তো প্রথমেই। নিচে থেকে অনিলের সানন্দ প্রশ্ন, "দাদা, একজনের কাছে টাটকা মাছ পাওয়া গেছে। নিয়ে নেব?" দু'দিন গাড়ি ও এক দিনের বাস যাত্রার পর একটু মাছের ঝোল জোটানো এখানে! আপত্তির কিছু থাকতে পারে? সরযূ নদীর ট্রাউট জাতীয় মাছ। অপূর্ব্ব মিষ্টি স্বাদ। এবারকার যাত্রায় দেখছি কিছু খাদ্য বৈচিত্র্য পাচ্ছি। শুধু আলু-মটরের আতঙ্ক কাটবে মনে হয়।

ভাড়ারিতেই প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা ও বাসনপত্রের ব্যবস্থা করে দুপুর দুটোর বাস ধরে চলেছি সঙ্। এই ষোল কিলোমিটার রাস্তায় এখন সাবধানে বাস চলছে। নতুন তৈরী রাস্তায় চলতে গিয়ে বাসের টালমাটাল অবস্থা। সঙে রাস্তার দুপাশে কয়েকটি দোকান। একটি বেশ বড়। আড়ৎদার মনে হয়। সব রকমের মালপত্রও মজুত। ভাড়ারিতে ভুলে গেলে এখান থেকেও কিছু কেনা যায়।

সঙ্ থেকেই হাঁটা শুরু। প্রথম হাঁটায় উৎসাহী সবাই। দেরি সয় না। পোর্টাররা মালপত্র খুলে নতুন করে বাঁধাছাঁদা করছে। ওজন সমান করার জন্য। করুক। আমরা এগিয়ে চলি। আজ তো মাত্র দুই কিলোমিটার যাব। চড়াই? কোন অসুবিধা নেই। সামনে দেখতে পাচ্ছি লোহারক্ষেত ডাকবাংলো। ছবির মত দেখাচ্ছে। পেছনে ফিরে

দেখি, অমর রাম ও পোর্টাররাও এসে গেছে। অমর রাম লোহারক্ষেত ছেড়ে এগিয়ে যেতে বলে। দল নিয়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু দলে লোক আরও একজন বেশি কেন? বাড়তি লোকের পিঠে তো আমাদেরই হ্যাভারস্যাক! কী ব্যাপার? ওর পয়সা কে দেবে? না জানিয়ে নিলই বা কেন?

লোহারক্ষেত ডাকবাংলো ছাড়িয়ে আরও দেড় কিলোমিটার চলার পর দুটি বাংলো খালিধারে। ঐখানেই থাকার ব্যবস্থা হল। 'খালিধার' নামটিতে রবিন বড় খুশি। "কেন রে?"—পরিমলের প্রশ্নের প্রথমে কোন উত্তর দেয় না। হাসে। এবার সবাই চেপে ধরি, "হাসছিস কেন? বলবি তো?" রবিন একগাল হেসে বলে, "আমি যে এসেছি তাও তো খালি ধার।"

সুন্দর জায়গা। বাংলোর তিন দিকে ঢেউখেলান চড়াই-উৎরাই। পাহাড়ে খাঁজকাটা কৃষিক্ষেত্র। দূরে ইতস্ততঃ ছড়ান বাড়িঘর। লাল রঙের ছাউনী। ইটেলী রঙের মাটি-পাথরের মধ্যে সবুজের সমারোহ। দূরে বনানীর পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে গিরিশিখর। স্কুলের ছেলেরা এসে ভীড় করেছে। কত তাদের প্রশ্ন! খুঁটিয়ে দেখছে ক্যামেরা ও জিনিসপত্র। চাইছে একটু ওষুধ নিজেদের জন্য, বাড়ির কারও জন্য। এরা ডাক্তার ওষুধ যে পায়ই না। ছোট ছোট ছেলের কথাবার্তায় কোন সংকোচ নেই। যেন কত দিনের চেনা। বিকেলটি বেশ জমে উঠল।

চোখ দেখে, কিন্তু মন সেই দেখাকে উপভোগ করায়। দেখবার মত যদি মন না হয় তাহলে সৌন্দর্য্যও কোন প্রভাব ফেলে না। মনে হয়, এ আর কী দেখব? মন আনন্দে থাকলে সাধারণও অসাধারণ রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। খালিধারের এই সৌন্দর্য্যের মধ্যেও মন অশান্ত ওই বাড়তি লোকের জন্য। ওকে কেন নিল? কাকে জিজ্ঞেস করে?

অমর রাম জানাল, "সামান অনেক বেশি হয়ে গেছে সাব।"

—আমাদের জানাও নি কেন?

—ইয়ে কসুর হো গিয়া সাব। আর কোথাও কুলি পাব না। তাই

রূপ সিংকে নিয়েছি ।

—কোন দরকার নেই । বাড়তি মাল আমরাই নেব ।

অমর রাম পোর্টারদের সঙ্গে অর্থবহ দৃষ্টি বিনিময় করে বলল, "ঠিক হ্যায় সাব । লেকিন্ কয়েকটা জায়গায় তোমাদের মাল বইতে তক্‌লিফ হবে । সুন্দরডুঙ্গার পথে সামানও বেশি থাকবে । পরে ওকে ছেড়ে দেব । পিণ্ডারী নিয়ে যাব না ।"

সব মিলিয়ে আঠার জনের দল । সুন্দরডুঙ্গার জন্যই রেশন যাবে আট দিনের । সুতরাং ওজন যথেষ্টই বেশি । অমর রামের যুক্তি মানতেই হল । রূপ সিংও যাবে । সিদ্ধান্তে পৌঁছান অর্থই মন হালকা ।

বেশ বড় ঘর । সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করছি । হাতে হাতে পেয়ে যাচ্ছি চা কিংবা কফি, ভাজাভুজি । ঘরের কোণে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে কালো মিশমিশে এক কুকুর । তাড়ালেও যায় না । শুধু চোখ তুলে তাকায় । যেন বলতে চায়, "কেন বিরক্ত করছ ? আমি তো খেতেও চাই নি । কেমন লোক তোমরা ?" সুতরাং থাক । নিজের দেশে, হয়তো নিজেরই ঘরে । আমরা তো মুসাফির ।

বাংলোর চৌকিদার এসে 'নমস্তে' জানিয়ে আলাপ করে । প্রশ্ন করে, "কোথা থেকে এসেছেন ?"

বলি, "কলকাতা থেকে ।" বাঙালী মাত্রই বিদেশে কলকাতার । অন্য জায়গার কথা ওরা জানলে তো ?

—কোথায় যাবেন ?

—পিণ্ডারী । সুন্দরডুঙ্গা ।

হঠাৎ যেন চৌকিদারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় । বলে, "সুন্দরডুঙ্গা যেও না ।"

—কেন ?

—কলকাতা থেকে তিন বাবু গিয়েছিল । এক আদমী মর গিয়া । কালই মুর্দা চলে আসবে ।

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি । কি আছে কপালে কে জানে ?

পথ জানি না। আশ্রয় নেই। আবহাওয়া কেমন জানি না। এখন শুধু অমর রাম ভরসা। একজন যখন মারা গেছে, তখন সব কিছু যে স্বাভাবিক নেই এটা তো বুঝতে পারি। আবার এটাও বুঝি যে সবাই মরে না। তবু পরমানন্দকে জিজ্ঞেস করি, "কি করবি রে?" ওর নির্লিপ্ত উত্তর, "ওরে আমরা যমেরও অরুচি।"

সুতরাং যাওয়া আমাদের হবেই। আড়ালে সাথীকে জিজ্ঞেস করি, "ভয় করছে?"

—না তো।

—পথ যে বিপদের শুনলে তো। তবু যাবে?

—তুমি তো সাথেই আছ। পরিণাম তো একই হবে।

৭ই অক্টোবরের সকাল হল। বেড টি হাজির। সবাই প্রস্তুত হয়ে নিতেই হাতে হাতে পেয়ে গেলাম নাস্তা। এরই মধ্যে অমর রামরা সব গুছিয়ে তৈরী হয়ে নিয়েছে।

আজ যাব ঢাকুরি। দশ কিলোমিটার পথ। তারপর ওখানে দুপুরের খাওয়া সেরে এগিয়ে যাব খাতি পর্যন্ত। এই হল পরিকল্পনা। চলার শুরুতে সবাই মুখর। এবার দলে আছে সত্যেন। কারণে অকারণে বকেই চলেছে। সুতরাং চুপচাপ চলে সাধ্য কার? তরুণ সঙ্গীরা একটু বেশি এগিয়ে যাচ্ছে। আমি চলেছি ধীরে। চড়াই ভাঙতে বুকে বেশ হাঁপ ধরে। তাছাড়া চারপাশের দৃশ্যাবলী দেখতে গেলে একটু দাঁড়াতেই হয়।

চলেছি ঢাকুরির গিরিপথ ধরে। পথের দু'ধারে, এ দিকে, ও দিকে বিশাল বিশাল পাইন, দেওদার আর রোডোডেনড্রন থারবেরিয়াম গাছের গায়ে গা লাগিয়ে মিতালী। ওদের বোধহয় ইচ্ছে পৌঁছুবে ঐখানে ১০৫৪১ ফুট উচ্চতায় গিরিপথের শিখরদেশে। বেশ ভাল লাগে এই উচ্চাশার প্রতিযোগিতা।

বিক্ষিপ্তভাবে দেখতে পাচ্ছি ফিক্ করে হেসে ফেলা সাদা ফুল 'Anemones' কিংবা গোলাপী রঙে পাপড়ি সাজান 'Geraniums'।

জিরিয়ে জিরিয়ে পায়ে পায়ে পথ চলা। দুরন্ত চড়াই। সামনেই দেখতে পাচ্ছি তিরতির করে বয়ে চলা কয়েকটি জলধারা। ঢাকুরি-বিনায়ক গিরিশিরা দিয়ে ঘেরা একটি সুন্দর সবুজ বুগিয়ালকে এই জলধারা সিক্ত করে দিচ্ছে। পাথরের ফাঁক দিয়ে মাটির উপর লেপ্টে থেকে পথিকের দিকে তাকিয়ে হাসছে হলুদ রঙা ফুল পোটেন্টিলা পেভাস্কুলারিস্ ও জিউম এলিটাম। রয়েছে সবুজ পাতার রুমেক্স।

"বরফ গলার পরই যদি আসতে" — মণিদা বলেন।

— তাহলে ?

— আরও কত কী ফুল দেখতে পেতে।

— কী ফুল ?

— Aquilegia, Delphinium, Epilobium, Meconopsis অর্থাৎ ব্লু-পপি, আইভরি রঙের Primula Reidii, আরও কত কী!

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলা। চড়াই ভাঙার ক্লান্তি। এরই মধ্যে হঠাৎ পেটের গণ্ডগোলে বিব্রত হয়ে পড়ায় বন্ধুদের থেকে অন্ততঃ এক ঘণ্টা পেছিয়ে গেছি। পা আর চলে না। বুঝতে পারছি, অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। মাঝে কয়েকবার অমর রাম শরীরের অবস্থা জানতে অপেক্ষা করেছে। আবার এগিয়ে গেছে। সঙ্গীরা কিন্তু অপেক্ষা করে নি।

আকাশে হঠাৎ মেঘের ঘনঘটা। ভাবনার কথা। অবশ্য ভেবেই বা কী করব ? প্রতিকার তো নেই। দূর থেকে দেখছি একজন মালবাহক শ্রীরাম অপেক্ষা করছে। কাছে গেলে ওকে চলে যেতে বললাম। মালপত্র নিয়ে কেন বেচারা বৃষ্টিতে ভিজে এই চড়াইর পথে কষ্ট পাবে ? নিচু স্বরে "ঠিক হ্যায় সাব" বলেও এগিয়ে গেল না। একই সঙ্গে চ'লে আমরা যখন পেঁাছলাম তখন বেলা প্রায় দুটো। বন্ধুরা অনেক আগেই পেঁাছে গেছে। বৃষ্টি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ক্লান্ত-অবসন্ন। একটু বিশ্রাম বড় দরকার।

প্রায় ৬৯০০ ফুট উচ্চতায় ঢাকুরিতে রয়েছে দুটো বাংলো। একটিতে জায়গা পেয়েছি। দুপুরের খাবারও সারা হল। এখান থেকে যেতে হবে খার্তি। এখনও ছয় কিলোমিটার। এই শরীর নিয়ে যেতে পারব কি? পরমানন্দ বলল, "ধীরে ধীরে চল।"

অমর রাম সিদ্ধান্ত জানাল, "আজ এখানেই হল্ট। মৌসুমও তেমন ভাল নয়। কাল সকালে বেরিয়ে সিধা আরামসে চলে যাব জাতোলী।"

বুঝলাম, মৌসুমটা অজুহাত। কারণ অনেক আগেই বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ পরিস্কার। আমার শরীরের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত। অথচ তা জানাতে চায় না।

মনোরম বাংলো। আকাশ এখন মেঘমুক্ত। রোদের তেজ কমে গেছে। লনে ঘুরে বেড়াচ্ছি সবাই। চোখ মেললেই অপরূপ দৃশ্য। দূরে পূবে-পশ্চিমে বিস্তৃত শুভ্র বরফের টোপর মাথায় নিয়ে মহামহিম হিমালয়। গা বেয়ে নেমে এসেছে জমাট বরফের ধারা। তারই নিচে কত যুগের প্রাচীন বৃক্ষরাজি উন্নত মস্তকে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে অনিন্দ্যসুন্দরের দিকে। মধ্য শিখরশ্রেণী দুই প্রান্ত উঁচু ও মধ্যে ঢেউ খেলিয়ে যেন শিশুর দোলনা তৈরী করে রেখেছে বরফ দিয়ে। তারই নিম্নভাগে আকুল আগ্রহে জড়িয়ে ধরার জন্য বনানী রয়েছে দু'বাহু বাড়ায়ে। ব্যাখ্যাহীন অনুভূতি!

শীতের রাত। সারাদিনের ক্লান্তি। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার আজ অসুস্থ শরীর নিয়ে অনেক ধকল গেছে। তবু ঘুম আসছে না। ধীরে কে যেন ডাকে, "সাব"। তাকিয়ে দেখি, অমর রাম। বলছে, "জেরা বাহার আইয়ে।"

নিশির ডাকের মন্ত্রমুগ্ধের মত ওর ডাকে বাইরে বেরিয়ে আসি। অন্ধকার রাত, কিন্তু হিমশিখরের শুভ্রতায় যেন আলোর বিকিরণ। নিঃঝুম রাতে এ কী মায়ার আবেশ! ঘর ছাড়ার সময় ব্যাকুল চোখে অনুনয় ছিল, "কেন যাও?" তাকে অবহেলায় ফেলে এসেছি। কেন আসি বোঝাতে পারিনি। এই মায়াময় নিশুতি রাতে করুণাঘন

হিমালয়ের অঙ্গনে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি আর মনে মনে বলি, "এই জন্যে।"

আলোয় ঝলমল ৮ই অক্টোবরের স্নিগ্ধ সকাল। নতুন সঙ্গী বীরুর ডাকে সবাই বেরিয়ে এলাম। বীরুও এবারই প্রথম হিমালয়ের পথে পদযাত্রায় বেরিয়েছে। সব কিছুতেই ওর আনন্দ। ওর নির্দ্দেশ মত তাকিয়ে আমরাও বিস্মিত। নিজস্ব ভঙ্গিমায়, নিজ নিজ রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে মৃগথুনি, মাইকতোলি, শুক্রাম, পানোয়ালী দোয়ার পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি। হিমালয়ের দিগন্ত বিস্তৃত বরফ শিখরে সূর্য্যের রঙীন আলোর আভা। শুভ্র সিঁথিতে সিঁদুর বরণ। অপূর্ব্ব !

আবার শুরু হল চলা। ঢাকুরিতেও আলোচ্য বিষয় ছিল কলকাতার যাত্রীর সুন্দরডুঙ্গায় মৃত্যুর। আজ চলার প্রথমেই উৎরাই। সবারই গতি বেড়ে গেছে। হিমালয়ের কোলে প্রাচীন বৃক্ষরাজি এ অঞ্চলে এখনও টিঁকে আছে। পাইন, দেওদার ও হর্স-চেষ্টনাট গাছের জঙ্গল। ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ চলে গেছে। রোদ ও ছায়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। সবাই থমকে গেলাম। চৌকিদার ও কয়েকজন স্থানীয় লোক বয়ে নিয়ে আসছে মিষ্টার মুখার্জীর মৃতদেহ। দেহ তারই স্লিপিং ব্যাগে ঢাকা।

আমাদের দেখে শবদেহ নামাল। "কী হয়েছিল ভাই ?"—প্রায় ইঙ্গিতেই জানতে চাই। শুনলাম, তিন বন্ধু গিয়েছিলেন সুন্দরডুঙ্গা হিমবাহে। ছিলেন তাঁবু খাটিয়ে। রাতে প্রচণ্ড বরফপাতে তাঁবু চাপা পড়ে। দুই বন্ধু ও পোর্টার পালিয়ে আসে। কিন্তু বেচারী মুখার্জী পালান নি। ঠাণ্ডায় মারা যান। অপর দুই বন্ধুকে তো দেখলাম না! এও হয় নাকি ?

বেদনায় ভরে গেল মন। নীরবে চলেছি। দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ি গ্রাম। সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে খাঁজকাটা কৃষিক্ষেত্র। ঝুম চাষ। প্রধান ফসল আলু ও রামদানা। দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে দু' চারটে বাড়ি। আজ ভাল লাগাও উচ্ছ্বসিত হচ্ছে না। মনে

পড়ছে মিঃ মুখার্জীর কথা।

ঢাকুরি থেকে ছয় কিলোমিটার পথ পার হয়ে পেঁাছেছি খাতি। উচ্চতা প্রায় ৭৫০০ ফুট। এখান থেকে পিণ্ডারী ও সুন্দরডুঙ্গার পথ আলাদা হয়ে গেছে। খাতি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ইন্সপেকসন বাংলো ও ট্যুরিস্ট বাংলো রয়েছে। খাবার হোটেলও রয়েছে। বাংলো ছাড়াও কয়েকটি বাড়িতে ১৫।২০ টাকায় ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। দুটো দোকান আছে। প্রয়োজনীয় সব জিনিসই পাওয়া যায়। এবং আশ্চর্য্যের ব্যাপার, শহরের দরে।

কাল আসার কথা ছিল। সেই ঘাটতি পূরণ করতে আজ আমরা এখানে থাকব না। ভোরে কখন যে অমর রামরা খাবার তৈরী করে নিয়েছে জানতেও পারি নি। রুটির সঙ্গে আলুর সব্জি। সব্জিতে রয়েছে রাইসর্ষের পাতার মিশ্রণ। সে এক ভিন্নতর অপূর্ব স্বাদ। এই দলটি দেখছি আমাদের ঘর ছাড়ার কষ্ট বুঝতেই দেবে না।

খাতিতে অনেকেই এসে আলাপ করছে। জানতে চাইছে কোথায় যাব। আজকের দেখা মৃতদেহ এদেরও বেশ বিচলিত করেছে। আলোচনা চলছে। কেউ বলছে, হিমবাহে রাতে থাকা উচিত হয় নি। বরফ পড়ার শুরুতেই নেমে আসা উচিত ছিল। কেউ বলছে, বন্ধুরা মিঃ মুখার্জীকেও ডেকেছিল, কিন্তু তিনি আত্মবিশ্বাসে আসেন নি। তাই এই মৃত্যু। কারও মতে, যদি সকালবেলাই বন্ধুরা বা কুলি-গাইড ফিরে গিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ব্রাণ্ডি খাওয়াত তাহলে ঠাণ্ডায় মারা যেত না। কারো মতে, অতিরিক্ত নেশা করার জন্য মিঃ মুখার্জী তাঁবু ছেড়ে বেরুতে পারেন নি।

সবই অনুমান। সঠিক কী হয়েছিল জানি না। তবে আমাদের কাছে বিস্ময়ের যে বন্ধুরা যদি প্রাণ ভয়েও পালিয়ে এসে থাকে তাহলেও দু'দিন পরে খাতিতে পেঁছনর পর স্থানীয় লোকের জিজ্ঞাসার উত্তরে ঘটনা জানাবে কেন? তার আগেই তো জাতোলীতে লোকালয় ছিল। কুলি-গাইডরাই বা কি করছিল? পরের দিনই মৃতদেহ আনতে যায়

নি কেন? প্রশ্নগুলি স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে। কে দেবে সঠিক উত্তর? মিঃ মুখার্জীর বন্ধুদের পাত্তা নেই। সঙ্গে কোন অভিজ্ঞ গাইড থাকলে এমন ঘটনা নাও ঘটতে পারত। অনেকেই ঠিকভাবে গাইড নির্বাচন না করে একটু খরচ কমাতে কুলিদের নিয়ে যায়, যেটা ঠিক না। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যাবে বাগেশ্বর। বাড়িতে টেলিগ্রাম করেছে। কেউ এখনও আসেনি।

স্থানীয় প্রভাবশালী এক ভদ্রলোক এসে আমাদের গন্তব্যস্থল জেনে অমর রামকে কিছু নির্দেশ দিলেন। অমর রামও জানাল যে আমাদের প্রয়োজনমত বিছানাপত্র ও তাঁবু নেই। সুতরাং উভয়েই অনুরোধ জানাল যে আমরা যেন কাঠালিয়ায় থাকি। দিনে গ্লেসিয়ারে গিয়ে আবার যেন কাঠালিয়াতেই ফিরে আসি। আমাদেরও আপত্তি নেই। জানি হিমালয় গোঁয়াতুর্মি ও অসাবধানতা ক্ষমা করেন না। ভদ্রলোক মনে করিয়ে দেন, "প্রতি বছরই সুন্দরডুঙ্গা কারও না কারও জান নেবেই। সাবধান।"

"মুখুজ্যে, খুব বেঁচে গেছি।"—থমথমে পরিবেশে সত্যেনের হঠাৎ আনন্দ।

—কেন?

—এ বছর প্রাণ যাবার কোটা আগেই পূরণ হয়ে গেছে।

খাতি থেকে দুপুর বারটায় আবার শুরু হল চলা। প্রথমেই গ্রামের ঘর-বাড়ি। ঘিঞ্জি। মনে হয় দুই তিন বাড়ির একই বারান্দা। গ্রামের ভিতর রাস্তা বড় নোংরা। মল এড়িয়ে পা ফেলার জায়গা নেই। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা রাস্তায়, ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আব্দার, "মিঠাই দোও"। চলতে চলতে যে যার পকেট থেকে লজেন্স বের করে দিচ্ছি। খুব খুশি। ছোট্ট চাহিদা, তুচ্ছ উপহার—অসামান্য আনন্দ। আমরা চাহিদাকে বড় করে আনন্দকে হারিয়ে ফেলেছি।

গ্রামের সীমানা ছাড়িয়েছি। বাঁক ঘুরলেই একটি পুল। কানে

আসছে জলের প্রবল আওয়াজ। বড় চেনা মনে হয়। কোথায় যেন শুনেছি এমনই কলহাস্য? এগিয়ে যাই। পুল পার হই। নিচে বয়ে যাচ্ছে নদী লাস্য ভঙ্গিমায়। কে? কে ও? কি নাম?

"খাস নাম কুছ নেহি হ্যায়। হামলোগ সুন্দরডুঙ্গা নদী কহতে হ্যায়।" —অমর রামের কথায় বিশ্বাস হয় না। এ যে ভীষণ চেনা—অ···থ···চ।

খিলখিল হাসি শুনে চমকে উঠি। বলি, "তুমি!"

—চিনেছ তাহলে?

—কোথায় ছিলে?

—সঙ্গমে।

—ধ্যেৎ।

—আমি মিথ্যে বলি না। একটু আগেই তো দেখতে পাবে। সুন্দরডুঙ্গার সঙ্গে···। আবার ড্যাব ড্যাব ক'রে চেয়ে থেক না বাপু।

—আচ্ছা তুমি কী?

—অভিসারিকা পিণ্ডারী। এস কিন্তু।

সাথীর মুখ থমথমে। এগিয়ে যায়। অনুসরণ করি। কিছু বলতে ভরসা পাই না।

প্রায় দুই কিলোমিটার উৎরাই বেয়ে গ্রাম ওয়াচ্ছাম। কয়েক ঘর বাসিন্দা। কাঁকরি হয়েছে প্রচুর। দেখেই মনে হয়, ক্ষেতের ফসলে সমৃদ্ধ গ্রাম। একটু বিশ্রামের ফাঁকে এক গেলাস গরম দুধ। এক টাকা। ভাল লাগলেই কি আর বসে থাকা যায়? সামনেই যে পথ হাতছানি দেয়। এঁকে বেঁকে উঠে গেছে কোন্ অজানার দিকে কে জানে? ওর ডাকে সাড়া দিয়ে আমরাও এগিয়ে চলি।

"সাব, সব এক্কাট্টা হো কে চলিয়ে।"—অমর রাম সাবধান করে।

—কেন?

—এইসেহি। জঙ্গলকা রাস্তা হ্যায় তো।

হিমালয়ের পথে একসঙ্গে চলার নিয়ম হলেও পদযাত্রীদের একসাথে

চলতে দেখা যায় না। কেউ যায় এগিয়ে, কেউ পড়ে পিছিয়ে। কেউ এগিয়ে গিয়ে বিশ্রাম নেয়। পিছনের লোক না থেমে এগিয়ে যায়। আগু-পিছুর মিলন হয়, আবার যায় হারিয়ে। পথই যেন শিক্ষা দেয়, সবাই সবাইর জন্য। কিন্তু কেউ কারও নয়।

এখনও আট কিলোমিটার পথ চলতে হবে। ওয়াচ্ছামের পর থেকেই শুরু হয়েছে চড়াই। বনের মধ্য দিয়ে পথ চলে গেছে। নানা রঙের পাতার বাহার নিয়ে বিশাল গাছেরা একে অন্যের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। বরফ ঝড় উপেক্ষা করে। মাঝারি আকারের গাছেরা তাদের ঘিরে সস্নেহ প্রশ্রয় পাচ্ছে। চীর-পাইন, দেওদার, ফার, জুনিপার, রোডোডেনড্রন না হয় চিনলাম, আর সব ? মণিদা জানেন ?

"Quercus Leucotrichophora, Conifers, Birch, Maples, West Himalayan Lilac (Syringa Emodi)।" মণিদা নামগুলো বলেই জানান, "কোনটা কি জানতে চেওনা যেন।"

চিকন বাঁশের ঝাড় আর খাগের বন কৈশোরের চপলতা নিয়ে হেসে ফেলল। হেলে দুলে গা জড়াজড়ি করে যেন বলছে, "এরা কে গো ?" পথ চলতে চলতে থামতেই হচ্ছে। না দেখে উপায় নেই। অচেনা পাখির ডাক শুনে চোখ ফেরাই এদিক ওদিক। কোন্ গাছের ডালে আড়াল থেকে মজা করে লুকোচুরি খেলছে বুঝতে পারি না।

দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। আমরা উঠছি তো ওপারের পাহাড় যেন ছোট হচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ দুই পাহাড়ের মাঝের উপত্যকায় মেঘ জমে যাচ্ছে। শুরু হল বৃষ্টি। মুষলধারে। যাদের কাছে বর্ষাতি নেই তারা একটি পলিথিন-সিট মাথার উপর লম্বা করে ধরে দুই তিনজন লাইন করে চলেছে। কমজোরি বর্ষাতি হাওয়া ও বৃষ্টির বেগে এবং কাঁধের বোঝার ঘসায় ছিঁড়ে গেছে। প্রাণপণ চেষ্টা চলছে ঐ ছেঁড়াটুকুকেই আঁকড়ে ধরার। পথে দাঁড়াবারও কোন জায়গা নেই। যেমন ইচ্ছে বেরিয়ে পড়ি। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়াই। বুঝি, উচিত নয়। কিন্তু সব গোছাতে গেলে যে বার হতে পারব না।

পথ চলতে পথকষ্ট তাই সহজেই মেনে নিতে হয়।

দুরন্ত চড়াই পথের যেন আর শেষ নেই। মুখর সত্যেনও আজ প্রায় মৌন। এক জায়গায় বসে তখনও হাঁফাচ্ছে। ওকে পার হয়ে এগিয়ে যেতে চাই। ইঙ্গিতে থামতে বলল। বসলাম। একটু দম ফিরে পেয়ে বলল, "এখন বুঝতে পারছি, কেন সাধুরা হিমালয়ে থাকেন।"

—কেন বল তো ?

এই গুঁতোয় কারও ঘরের কথা মনে থাকে ?

—চল, এগিয়ে যাই। এরপর যখন বিশ্রাম নেবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিও। কষ্ট কম হবে। তাড়াতাড়িই বা চলছ কেন ?

—সবাই যে এগিয়ে গেছে।

—যাক না। জাননা, হিমালয়ে চলার অলিখিত নিয়ম ? ধীরে চল্‌না, কম খানা, কম বোল্‌না।

দিনের আলো কমে আসছে। দেখা যায় গ্রাম। মনে ভরসা জাগে। পথও এবার নামার। নেমে ছোট্ট পুল দিয়ে নদী পার হয়েই আবার চড়াই। এই চড়াইর পরই গ্রাম জাতোলী। শেষ চড়াইটুকু ভাঙতে বেদম অবস্থা। প্রথমেই পথের ধারে যে ঘরের বারান্দা পেলাম শুয়ে পড়লাম তিনজন—আমি, পরিমল ও সত্যেন। এখান থেকে রাস্তা দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে। দলের বাকি সব কোথায় কোন রাস্তায় গেছে কে জানে ? কেউ একজন থাকবে তো ? দুই পাড়ার বিশালকায় কুকুরগুলি এলাকার দখল নিয়ে লড়াই চালিয়েছে। অচেনা লোক আমরা। আমাদের নেড়িদের কামড়েই চৌদ্দটা—এরা কামড়ালে যে কটা ইঞ্জেকসন লাগবে কে জানে ?

একটু বাদেই পোর্টার হিম্মৎরাম এসে হাজির। দূরের এক বাড়ি দেখিয়ে বলল, "বাবুজী, উধার চলিয়ে।"

"আর কোথাও যাব না।" পরিমল রেগে বলে।

হিম্মৎরাম মিটিমিটি হাসে। বলে, "কাল রাতমে ইঁহা মুর্দা থা।"

"মুর্দা ? মানে মরা ? মুখার্জী ?" সত্যেন তিড়িং করে উঠে পড়ে। চলতে থাকে হিম্মতের পিছন পিছন।

হিম্মৎরামের উদ্দেশ্য সফল। এতদূর অতো মাল বয়েও ওর মনে বড় স্ফুর্তি। চলতে চলতেই গাইছে "যিস্‌কি বিবি মোটি…।"

জাতোলী সুন্দরডুঙ্গার পথের শেষ গ্রাম। প্রায় ৮৫০০ ফুট উচ্চতা। লোকবসতিও বেশ। একটি দ্বিতল বাড়িতে আশ্রয় পেলাম। এটিও একজন গাইডের বাড়ি। নিচের ঘরে প্রয়োজনীয় কিছু চাল-আলু-মশলা ইত্যাদির ছোট্ট দোকান। তার পাশেই বক্‌রি রাখার ব্যবস্থা ও রান্নাঘর। আমরা আছি উপরের ঘরে। দরজা বলতে তিন ফুট উঁচু এক টুকরো তক্তা। সরিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। ঠিক মাঝখানটা ছাড়া অন্য কোথাও দাঁড়াতে গেলেও মাথা সোজা করা যায় না। মেঝেয় কাঠের উপর বিচুলি বিছানো। ভীষণ ঠাণ্ডা। ঘরে ঢুকতেই গরম কফির পেয়ালা হাতে অমর রাম হাজির। একটু আগের রাগ প্রকাশের অবকাশ আর হয় না।

রাতের আহারপর্বও শেষ হল। শোবার আগে প্রতি রাতের মতোই অমর রামের আবির্ভাব এবং জানিয়ে দেওয়া কালকের প্রোগ্রাম, "বেড টি'র পর নাস্তা খেয়ে আটটায় স্টার্ট। যাব কাঠালিয়ায়। পথে দুপুরের খাবার বানিয়ে নেব। রাস্তা আচ্ছা হ্যায়। কুছ্‌ তক্‌লিফ নেহি। চড়াই থোরা থোরা। মৌসুম ভি আচ্ছা হ্যায়। ধীরে ধীরে সিধা আরামসে চলা যায়গা। গুড নাইট।"

বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। নীল আকাশের নিচে তারারা মিটিমিটি হাসছে। যেন বলতে চাইছে, "কেমন মজা!" স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় গিরিশিখর হিমানীর প্রসাধন মেখেছে। মায়াময়। সুরেলা কণ্ঠে নন্দাদেবীর বন্দনা গান (জাগার) ভেসে আসছে। কে গায়? এই মায়াবী রাতে একান্ত ভক্তি ও ভালবাসার অর্ঘ্যখানি কে সাজায়! মানুষকে ঘর থেকে বার করে বেদীমূলে পৌঁছে দেয় এ কোন্ সুরসাধক? নিচে নেমে যাই। তীব্র শীত উপেক্ষা করে পাহাড়ের দিকে মুখ করে

উঠোনে বসে একমনে আত্মভোলা হয়ে গেয়ে চলেছে রূপ সিং, যাকে আমরা আনতে চাইনি। সময় পার হয়ে যায়। গানের সুরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে পারি না। শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে দেখি হিমালয়কে, রূপ সিংকে।

৯ই অক্টোবর। সকাল হল। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দরজা পার হয়েই বিস্ময়! সামনেই স্নিগ্ধ, শুভ্র হিমশিখর। যেন সোহাগরাতের অবসানে ব্রীড়াবনতা। সলাজ সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে। চিত্রপট এঁকে দিয়েছে সবুজ বনানী। নির্মেঘ সুনীল আকাশ চাঁদোয়া বিছিয়ে দিয়েছে। ক্ষেতে এই সকালেই কাজে লেগে গেছে মেয়েরা। মাটির নিচ থেকে আলু তুলে ঝুড়ি ভরছে। পুরুষরা কেউ হাল ধরেছে। কেউ ভেড়া-ছাগলের পাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কোথাও কোন ব্যস্ততা নেই। সব কিছু হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়মেই। কারও কোন তর্জন নেই। নেই কারও ফাঁকির ইচ্ছা। জীবন কর্মময় কিন্তু কর্মের দাস নয়। প্রকৃতির প্রভাব মানুষের চরিত্রে, জীবনযাত্রায়। আমাদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু এই অমিলটুকু বড় লোভনীয়।

"তুমি বড় আনমনা হয়ে যাচ্ছ। কেন? ঘরের কথা ভাবছ?" সাথী মায়াবী চোখ দুটো মেলে জানতে চায়।

—ঘর? না। কার কথাই বা ভাবব?

—কেন? তাঁকে। পথ আগলে যে জানতে চায় 'কেন যাও?'

বুকের কোথায় যেন একটা বেদনা চিনচিন করে ওঠে। বলি, "অধরাকে ধরা যায় না।"

—ধরতে চেয়েছ কখনও?

—না। তুমিই তো আছ।

সাথী দূরে সরে যায়। মনে সন্দেহ। দ্বিধা। এই ভাল লাগার উৎস যে ও নয় বুঝতে পারে। তবু সে জানে আমার ভাগ্যর সঙ্গে ওর মঙ্গলসূত্র বাঁধা। অথচ এই বাঁধন কাটালেই ওর মঙ্গল হত।

অমর রামরা সদলে এগিয়ে চলে। যাব ষোল কিলোমিটার দূরে

কাঠালিয়ায়। পাহাড়ে যেমন হয়, বিশ্রামস্থান থেকে চলার প্রথমেই চড়াই। গ্রামকে পিছনে রেখে এগিয়ে চলেছি। প্রথম চড়াইতেই যে বেদম হবার অবস্থা! কিছু পরেই পথরেখা প্রায় নেই। বনের মধ্য দিয়ে দল চলেছে এগিয়ে। বনবিছুটির বড় উৎপাত। গায়ে লাগামাত্র মনে হয় যেন শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। অমর রাম প্রায়ই হুঁসিয়ারী দিচ্ছে, "সব একসাথ চলিয়ে।"

কত রকমের গাছপালা! পরিচয় জানি না। তাদের নিবিড়তা, রঙের বিভিন্নতা ও ছায়ার স্নিগ্ধতা উপভোগ করে এগিয়ে চলি। ডান পাশে নদীর কলোচ্ছ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসে। বনের মধ্য থেকে নানা রঙের পাখির কলকাকলী ভেসে আসে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এগিয়ে আসে অমর রাম। বলে, "সুন্দরডুঙ্গার রাস্তা আমার ভীষণ ভাল লাগে। অন্য কোথাও বেশি টাকার যাত্রী ছেড়ে দিই যদি এই পথের যাত্রী পাই। এখানে মনটা যেন ভরে ওঠে।"

পয়সার বিনিময়ে মাল বওয়া মজুর আর পয়সা খরচ করা সৌখীন পদযাত্রী। এক জায়গায় দ্‌জনেই সমান। ভাল লাগা আর ভালবাসা। তাও একজনকেই। সেই একজনই তো সে। মহান হিমালয়। তার পথ। সেই পথ ধরেই হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাওয়া।

সঙ্গীদের অনেকেই এগিয়ে গেছে। টেলি লেন্স লাগিয়ে ওদের দেখছি। অত উপরে? টেলিতেও যে ওদের একটা বিন্দুর মত লাগছে! আমাকেও তো ওখানে উঠতে হবে। আবার স্বস্তি পাই ভেবে যে চড়াইর পরই উৎরাই পাব।

প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এসেছি। জঙ্গলের মধ্য থেকে বেরিয়েই দেখি তুমুল শব্দ করে বয়ে যাচ্ছে জলধারা। পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে। ওপারে কুশলরামদের সঙ্গে পাথরের উপর বসে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে স্বপন। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এক খাড়া পাথরের উপর দিয়ে প্রায় স্লিপ কেটে নেমে আসতে হবে ঐ জলধারার কাছে।

তারপর পাথর টপকে পার হওয়া। সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত অমর রাম ও ভগবান। এই ভগবান ছেলেটিকে দেখছি। অমর রামের পরই ওর সচেতনতা। ভবিষ্যতের এক নিষ্ঠাবান গাইডের প্রতিশ্রুতি।

এই জলধারাকে কি বলব? ঝরণা, না নদী? নাম ভিনওয়ানালা। জলপ্রপাতের মত নেমে এসে উচ্ছ্বসিত কলহাস্যে বোল্ডারের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে। বাধা পেলে যৌবনের দৃপ্ত গরিমায় টপকে যাচ্ছে অবহেলায়। দু'পাশের বনারীরা সস্নেহ কৌতুকে দেখছে নৃত্যরঙ্গিনীকে। নিজেরই আনন্দে এগিয়ে চলেছে ভিনওয়ানালা নৃত্যভঙ্গিমায়।

আমরা এগিয়ে চলেছি মোহাবিষ্টের মত। ভিনওয়ানালা থেকে আরও প্রায় তিন কিলোমিটার এসেছি। বনের মধ্য থেকেই শুনতে পাচ্ছি জলের গর্জন। ভৈরবনালা। এবার আর খাড়াই পাথর বেয়ে নামা নেই বটে, কিন্তু তার থেকেও আরও বেশি বিপদ লুকিয়ে রয়েছে। তীব্র জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে পাথরের উপর দিয়ে। গাছের দু'টি ডালকে বনের লতা দিয়ে বেঁধে সাঁকো বানান হয়েছে। লতায় জড়ান ফাঁকগুলি ঘাস ও মাটি দিয়ে ভরানর চেষ্টা করা হয়েছে। যে কোন সময় পা সরে যাবার আশঙ্কা। ধরবার তো কিছু নেই। শুধু শরীরের ভারসাম্য রেখে পার হওয়া। কারও পক্ষে এগিয়ে এসে হাত বাড়াবারও উপায় নেই। ঘাবড়ালেই মুশকিল। ভাবনা ছিল তপনকে নিয়ে। ৮০ কেজি দেহের ভার। কিন্তু অবলীলায় পার হয়ে এল সবাই। স্বস্তির সাথেই আনন্দের জোয়ার। এখানেই রান্না চেপে গেছে দুপুরের জন্য। বড় বড় পাথরে সবাই গা এলিয়ে দিয়েছে। নাগকুণ্ডের কাছ থেকে সৃষ্টি হয়ে ভৈরবনালা বয়ে চলেছে ভৈরব মূর্তিতে। শীতের দিনে সূর্য্যের প্রখরতা। বয়ে চলা নদীর পাশে গা এলিয়ে শুয়ে-বসে চড়াই ভাঙার ক্লান্তির পর বিশ্রাম ও আহার। পিক্‌নিক্ মুড্।

সুখ ক্ষণস্থায়ী। ভৈরবনালার পরই কঠিন চড়াই। ছোট ছোট গাছের গোড়া অথবা ঝুলে থাকা গাছের ডাল ধরে উঠতে হচ্ছে। লক্ষ্য

তখন কেবলই ওঠা। তাই আর কিছু ভাববার অবকাশ নেই। জাতোলী থেকে প্রায় আট কিলোমিটার এসে পেঁছিলাম প্রায় ৯৫০০ ফুট উচ্চতার ঢুণ্ডিয়া ঢন। ডানপাশে বয়ে চলেছে সুন্দরডুঙ্গা নদী। রয়েছে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড। রাস্তার একপাশে একটি ঝুলন্ত পাথর (ওভার হ্যাঙ) গুহার সৃষ্টি করেছে। থাকা যায় কোন রকমে। আমাদের আজ এখানে থাকার দরকার নেই। এগিয়ে চলি।

গন্তব্যস্থল কাঠালিয়া। এখনও আট কিলোমিটার। শুধুই চড়াই। সামনে গিলা পাহাড়ের ধ্বস। পথ বলতে কিছুই নেই। ঝুরঝুরে মাটির ধ্বসের উপর দিয়ে মাত্র তিন ফুটের মত জায়গা পাওয়া যাচ্ছে চলার। এক হাত দিয়ে ধ্বসা পাহাড়ের গা ধরতে ইচ্ছে হয়। পাশেই গভীর খাদ। ধীরে পা ফেললে শরীরের ভারে মাটি সরে যাচ্ছে। তাই হাল্কা পায়ে দ্রুত পার হতে হচ্ছে জায়গাটা।

পোর্টাররা এগিয়ে গেছে। উপরে মাল নামিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। ক্যামেরার ব্যাগ নিয়ে অমর রাম আমার পিছনে রয়েছে। পরমানন্দ গিলা পাহাড়ের গা ধরে ধ্বস পার হচ্ছে। ওর পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আর্ত চীৎকার ক'রে উঠি, "অমর রাম! লীডারকো সামালো।" কথা শেষ না হতেই দেখি, অমর রাম দৌড়ে গিয়ে এক হাতে পরমানন্দর হাত ধরেছে; আর এক হাতের লাঠি দিয়ে নরম মাটিতে ছোট ছোট খাঁজ তৈরী করে দিচ্ছে। যাতে অন্ততঃ পায়ের গোড়ালি রাখা যায়। পরমানন্দকে দেখিয়ে দিচ্ছে কোথায় কোথায় পা ফেলতে হবে। পোর্টাররা প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে—অর্থাৎ বিশ্রাম মোটেই নয়।

সবাই পার হয়ে এলাম।

পার হয়েই আবার বাধা। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে খাড়া পাথর। পাথরের ডানপাশের কোণা ও খাদের মাঝে এক ফুটের মত জায়গা। ব্যালান্সের খেলার মত গতির সাথে পা ফেলেই শরীর ঘুরিয়ে পাথরের অপর পিঠে চলে যাওয়া। গিয়েই খাড়া পাথরের গা বেয়ে নামতে হবে

অন্ততঃ ছয়টি পদক্ষেপ। হুমড়ি খেয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। প্রায় দু'শ' ফিট নিচেই খাদ। তরুণ বন্ধুরা সহজেই পার হয়ে গেছে। আমিও নামছি। মাত্র দু'টি পদক্ষেপ নিয়েছি। কী করে যেন পা দু'টো সমান্তরালে চলে এলো ঢালু পাথরটার উপর। কিছু না ধরলে আর পা ওঠানো সম্ভব নয়। অথচ কিচ্ছু ধরবার নেই। পতন অবশ্যম্ভাবী। সাথীর আর্তনাদ ভেসে আসে, পাথরের উপর গা ছেড়ে দাও।" তাই করব? আর তো কিছু করারও নেই।

"সাব্! মেরা পায়ের কা উপর পায়ের লাগাও।" তাকিয়ে দেখি অমর রাম। পাথরের উপর হাওয়াই চপ্পল পায়ে টিকটিকির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পায়ের খাঁজে পা লাগিয়ে নিচে নেমে এলাম। বিপদ, সাহস ও ধৈর্য্যের একটি মুহূর্ত পার হয়ে গেল।

পরমানন্দর সোজা কথা, "তোর বন্ধু সেই কুণ্ডুবাবুকে ডেকে আন। নিজেরা সাহস পায় নি, আমাদের মরতে তাতিয়েছে।"

অমর রামকে জিজ্ঞেস করি, "এইখানে সবাই কি এভাবে পার হতে পারে?"

—রাস্তা তো কই খাস খারাব নেহি। কভি কভি ট্যুরিস্টকো কান্ধেমে লেকর পার হোনে পড়তা।"

বোঝ অবস্থা। তাও নাকি রাস্তা বিশেষ খারাপ নয়!

"আমার ক্যামেরার ব্যাগ কই?" অমরকে জিজ্ঞেস করি।

—ছোড়কে আয়া সাব। লাতে হুঁ।

পরমানন্দকে গিলা পাহাড় পার করাবার সময় ক্যামেরার ব্যাগ ছুঁড়ে ফেলে এসেছিল। দামী জিনিস বলে যত্নের অভাব ছিল না। ছিল সাবধানতাও। কিন্তু যখনই দেখেছে মানুষের বিপদ, বস্তুর দাম তুচ্ছ হয়ে গেছে। এখন যখন সব কিছু ঠিকঠাক চলছে, তখনই বস্তু আবার হয়ে উঠেছে মূল্যবান। অমর রামদের বোঝা দায়। কোন কিছুতেই উৎসাহ হারাতে দেয় না। খালিধারে যখন লোক কমাতে বলেছিলাম যে আমরাই বইতে পারব, তখনও পথের কথা বলে

আমাদের নিরুৎসাহ করেনি। শুধু নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল। তখন প্রকৃত অবস্থা জানালে কী করতাম কে জানে? আসতাম কি?

প্রায় দুশ' ফুট ঢাল বেয়ে নেমে এলাম। কিছুটা যেতেই আবার ধাঁধাঁ। পথ কোথায়? বড় বড় পাথর পথ অবরোধ করে রেখেছে। পোর্টারদের দেখাদেখি ঐ পাথরের মাঝের ফাঁক দিয়ে কখনও হামাগুড়ি, কখনও শরীরকে বাঁকিয়ে, কখনও ঝুঁকে পার হয়ে এলাম। দেখছি, তখনও কয়েক জায়গায় বরফ জমাট হয়ে রয়েছে। শীতের সময় এ রাস্তা পুরোটাই বরফে ঢেকে যায়। অমর রাম জানায়, "মে-জুন মাসে এস। এখান থেকে সোজা নিয়ে যাব সুন্দরডুঙ্গা হিমবাহে। পথ অনেক কম হবে। দেখতে হবে আরও সুন্দর।"

ছোট-বড় পাথরের স্ক্রী জোনের উপর দিয়ে নদীর কূল ধরে এগিয়ে চলেছি। গোমুখে পৌঁছবার আগে যেমন খানিকটা পথ, তেমনি এই পথ প্রায় এক কিলোমিটার হবে। সাবধানে প্রতিটি পাথরকে লক্ষ্য করে চলতে হচ্ছে। চোখ কোনদিকে সরাবার উপায় নেই।

সেই পথও শেষ হল। এবার আবার চড়াই। গভীর বনের মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে। উপত্যকায় মেঘের খেলা। যেন হাজার হাজার উনুনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। সামান্য দূরের লোককেও দেখা যায় না। আমরা মেঘের মধ্য দিয়ে চলেছি। স্যাঁতসেতে লাগছে গা। শঙ্কিত। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামলেই চূড়ান্ত দুর্ভোগ। সুতরাং দ্রুত চলার তাগিদ। ইচ্ছে থাকলেই কি আর তা সম্ভব? একটু জোরে চলতে গিয়ে আরও কষ্ট। পিছনে পড়ে গেছি আমি, সত্যেন, পরিমল ও বীরু। প্রথম চলার দিন দ্রুত হাঁটতে গিয়ে বীরুর হাঁটুতে চোট লেগেছে। বেচারা চলতে গিয়ে রীতিমত খোঁড়াচ্ছে। তবুও তাড়া লাগাই, "বীরু, জলদি চল। একে বন, তার উপর মেঘ। সন্ধে হলে যে আরও বিপদ।"

বীরুর অসহায় দৃষ্টি। বলে, "শুয়ে-বসে থাকছি না, এই যথেষ্ট। আর জোরে হাঁটা অসম্ভব।"

—জঙ্গল দেখছ তো? অমর রামের কথা মনে কর। ভালুক আর চিতা তো আছেই।

—এখানে জন্তু-জানোয়ার মরতে আসবে?

কোথাও কোথাও মাটির সাথে মিশে গেছে ছোট ছোট গাছ ও খাগের মত সরু বাঁশ ও ঘাস। রোলার চালালে যেমন হয়, তেমনি চিহ্ন চলে গেছে ঢাল বেয়ে নদীর দিকে। বীরুকেও দেখাই। বলি, "ওখান দিয়ে বাঘ ও অন্য জন্তুরা নদীতে জল খেতে যায়। এ তারই চিহ্ন।"

একটু পরেই খেয়াল করি যে বীরু নেই। ও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। পায়ের যন্ত্রণার কথা বোধহয় ভুলেই গেছে। বাঘ ভালুকের ভয় কারই বা নেই?

সামনেই বুগিয়াল (তৃণক্ষেত্র)। নিচে দেখা যাচ্ছে নদীর দুপারেই মেষপালকদের কয়েকটি ঘর। দ্রুত নেমে আসি নদীর কূলে। একখণ্ড বিশাল পাথর নিজেই নদীর উপর সেতু হয়ে রয়েছে। একটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পরিচয় করল চারটি ছেলে। হাওড়া থেকে এসেছে। আজ মাইকতোলী ঘুরে এসেছে। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। কাল বিশ্রাম নিয়ে আবার যাবে শুকরাম গলি। আমরাও মেষপালকদের পরিত্যক্ত একটি ঘরে আশ্রয় নিলাম।

কাঠালিয়া ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড। সুন্দরডুঙ্গার গেটওয়ে। উচ্চতা ১০৫০০ ফুট। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরডুঙ্গা গিরিশ্রেণী। মাঝে মধ্যেই ধসে পড়ছে বরফের আস্তরন (অ্যাভেলেন্স)। তারই শব্দ শান্ত নির্জন পরিবেশকে হঠাৎ হঠাৎ চমকে দিচ্ছে। ঝুপড়ির সামনে দিয়ে অপ্রশস্ত মাইকতোলী নালা বয়ে চলেছে মৃদু শব্দে।

বেশ ঠাণ্ডা। ঘরের চালায় ও দেয়ালের ফাঁকে বর্ষাতি ও পলিথিন সিট ঢেকে দেওয়া হল। তা নাহলে রাতে বরফ ও ঠাণ্ডা আটকান

যাবে না। ঘরের মধ্যে কাঠের আগুন জ্বেলে রান্না চেপে গেছে। আমরাও আগুনে গা গরম করে নিচ্ছি। শোয়া? অসম পাথরের ঢালু মেঝেতে গাদাগাদি করে শরীরকে সোজা রাখাই দায়। ক্লান্তিতে ঘুম তো হবেই।

কিন্তু বীরু ঘুমুতে পারছে না। ও আগুনের কাছ ঘেঁসে শুয়েছে। উস্কে দেওয়া কাঠের আগুন থেকে প্রায়ই ফুল্‌কি উঠছে। যদি বীরুর স্লিপিং ব্যাগে লাগে তো ব্যাগটাই গেল। বীরু তাই কেবলই উঠে পড়ছে। তার সঙ্গে রয়েছে হাঁটুর ব্যথা। কী যে করবে ঠিক পায় না। রবিন ওকে বলে, "তুই ওপাশে শো।"

—ঠাণ্ডা লাগবে না?

—আমার লাগছে না?

—আগুন নেভাতে বল।

—আর সবাই ঠাণ্ডায় মরুক। চুপ করে শুয়ে থাক।

বীরু কারও কাছ থেকে সমর্থন না পেয়ে চুপ করে থাকে। ঘুমিয়ে পড়ে।

১০ই অক্টোবরের সকাল হল। নির্মেঘ আকাশ। সুন্দরডুঙ্গা-মাইকতোলী হিমবাহের হাতছানি। সবাই তৈরী হয়ে নিই। অমর রামকে জিজ্ঞেস করি, "এখান থেকে কোথায় কোথায় কিভাবে যাওয়া যায়?"

যে সব অভিযাত্রীর তাঁবু আছে তাঁরা কাঠালিয়া থেকে মাইকতোলী নালা ধরে যাবেন ৮ কিলোমিটার দূরে মাইকতোলী হিমবাহে (১৪০০০ ফুট)। ওখানে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড আছে। মাইকতোলী ও অন্য সব সুন্দর বরফাচ্ছাদিত শৃঙ্গ দেখা যায়। তাঁবু না থাকলে দেখে আবার ফিরে আসা যায় কাঠালিয়ায়।

কাঠালিয়া থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে রয়েছে আর এক অপূর্ব দ্রষ্টব্যস্থান নন্দাকুণ্ড (১৪৫০০ ফুট)। নন্দাকুণ্ড হ্রদকে চারধার থেকে ঘিরে রয়েছে অনন্যসুন্দর বরফ শিখরগুলি। দেখে আবার ফিরে

আসতে হবে কাঠালিয়ায়।

আর এক আকর্ষণীয় স্থান শুকরাম হিমবাহ (১৩০০০ ফুট)। দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। থাকার জন্য ছোট্ট গুহাও আছে। এখান থেকে দেখা যায় শুভ্রশিখর গিরিশ্রেণীর রাজকীয় ভঙ্গিমা। থাকার অসুবিধা হলে আবার নেমে আসতে হবে কাঠালিয়ায়।

অমর রামের বর্ণনা শুনি। তারপরই ওর বিনীত নিবেদন, "সাব, আপ যানে মাঙ্‌তা তো হাম লে যানে সক্‌তা। লেকিন মৌসুম আচ্ছা নেহি। আউর আপকা স্লিপিং ব্যাগ ব্যাগেরা ভি নেহি হ্যায়। অ্যাভেলেন্স হোতা হ্যায় উধার। তো বালৌনী টপ চলিয়ে। রাস্তা ভি আচ্ছা হ্যায়। সব পিক্‌ ভি বহুৎ আচ্ছা দেখাই যাতা উহাসে।"

মনে পড়ছে মিঃ মুখার্জীর মৃত্যুর কথা, খাতিতে ভদ্রলোকের অনুরোধের কথা, কাল ফিরে আসা হাওড়ার ছেলেদের অভিজ্ঞতার কথা এবং নিজেরাই দেখছি অ্যাভেলেন্সের ভয়াল সৌন্দর্য্য। অমরের উপর আস্থা হারাবার কারণ নেই। আমরা সিদ্ধান্ত নিই বালৌনী টপই যাব। এবার না হয় বাদই থাক শুকরাম, নন্দাকুণ্ড, মাইকতোলী। অমরা তো অভিযানে বেরুই নি। দেখতে এসেছি। যেখান থেকে যা দেখা যায়, তাতেই আমাদের তৃপ্তি।

সকালের খাবার সঙ্গে নিয়ে শুরু হল হাঁটা। আজ আর মাল বইবার দরকার নেই। তাই সঙ্গে যাচ্ছে অমর রাম, ভগবান, স্বরূপ রাম ও রূপ সিং। বাকিরা ঝুপড়িতে থেকে গেল রান্নার জন্য।

প্রথম থেকেই চড়াই। বনের মধ্য দিয়ে চলেছি। পথ নেই। অনুসরণ করছি এগিয়ে যাওয়া দলকে। প্রায় এক ফুট উচ্চতায় প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। যেখানে আরও বেশি, হাঁটু-কোমরে জোর আনতে কিছু ধরে নিতে হচ্ছে। ধরবার জন্য প্রয়োজনীয় মুহূর্তেই হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছি ঝুঁকে থাকা গাছের ডাল। ভূর্জ জাতীয় গাছই বেশি। মানুষের পায়ের শব্দে ঝোপ থেকে উড়ে যাচ্ছে নানা রঙের পাখি।

আজ প্রথম চলাতেই কিশোরের মাথায় চক্কর লেগে গেছে। বমি-বমি ভাবের জন্য চলতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। থেমে যাচ্ছে। পিছিয়ে পড়ছে। অলটিচিউড এফেক্ট। প্রতি পর্বতযাত্রায় কিশোর সবার আগে পৌঁছে যায়। এবার পারছে না। আর এ যে কী কষ্ট আমি জানি। সেবার রূপকুণ্ডর পথে দুরন্ত চড়াই কৈলু বিনায়কে পৌঁছবার আগে আমারও এমনিই হয়েছিল। কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানও ছিল না। হুঁশ ফিরতে দেখি একমাত্র কিশোরই পাশে ব'সে অপেক্ষা করছে। আজ ওকে ছেড়ে যেতে পারি না। ধীরে ধীরে একসঙ্গে এগিয়ে চলি।

একটি বাঁকের মাথায় অপেক্ষা করছে অমর রাম। আমি পৌঁছুতেই নীরবে এক দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, "ফটো লে লেও।" তাকিয়ে আমি বিস্ময়ে হতবাক। হিমালয়ের এ কী অপরিসীম সুন্দর রূপ!! গভীর খাদের উপর থেকেই সবুজ, বাদামী গাছেরা উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মত ছোট বড় অগুনতি পর্ব্বতশিখর। কোনটা সবুজের মোড়কে আবৃত। কোনটা রয়েছে বরফের টোপর পরে। কোনটার রঙীন পাথরের কপোলে সাদা বরফের চন্দনফোঁটা। ছোট-মাঝারি শিখরগুলির পাশে বড়রা রয়েছে উন্নত-শির। কিন্তু ঔদ্ধত্য নেই। সকলে মিলে এক শান্ত সুখী পরিবার। মাথার উপরে স্নেহে নীল আকাশের বুকে শুভ্র বলাকার মত আনন্দে ভেসে যাচ্ছে হাল্কা মেঘেরা। অমর ও আমি পাশাপাশি কাঁধ জড়িয়ে বসে আছি। ভাষাহীন। ভাল লাগা ও ভালবাসার একাত্ম মূর্ত্তি। শহরের বাবু ও পাহাড়ি কুলির এই মুহূর্তে কোন প্রভেদ নেই। হিমালয় মহান। সবার সব আমিত্বকে হরণ করে নেয়।

"যাবে না?"—স্বগতোক্তির মত সাথীর কথায় বাস্তবে ফিরি। অমর রাম বোধ হয় অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে এগিয়ে যাওয়া দলকে ধরতে। সুতরাং যেতেই হয়।

কিছুদূর গিয়ে দেখি বীরু ও তপন অপেক্ষা করছে। পায়ের ব্যথা ও ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত। ওরা ঠিক করেছে ফিরে যাবে। কিশোরকেও

বলে. "ফিরে চল।" বলি, "একটু বিশ্রাম পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এই উচ্চতায় ও চড়াই ভাঙতে এরকম তো হবেই। ধীরে ধীরে চল।"

ততক্ষণে তপন ক্ষিপ্ত, "বেড়াতে আসা মানে এই? মরতে? আগে জানলে কক্ষণও আসতাম না।"

—এখন তো চল।

—পথ চিনব কি করে? গাইড বা দলের কেউ আছে? নেতা ও গাইডের তো কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত?

—নিশ্চয় এখন আর পথের তেমন গোলকধাঁধা নেই। দরকার হলে ওরা এসে নিয়ে যাবে।

—একবার ফিরে যেতে পারলে হয়। ষ্টেশনে পৌঁছেই নেতাকে দুই খিস্তি মেরে বাড়ি চলে যাব। গুরুজন বলে মানব না।

—ফিরে যে যাবে, পথ চিনতে পারবে? হারিয়ে গেলে কেউ খুঁজে পাবে না। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে মরতে হবে।

এবার তপন দ্বিধায় পড়ে। তবু গজরানি থামে না। বীরু ফোড়ন কাটে। কিশোর চুপচাপ বসে আছে বুগিয়ালের মধ্যে।

বর্ষার শেষে যে সবুজের সমারোহ তা এখন নেই। সবুজ তৃণক্ষেত্রে ফুলেরা অর্ঘ্য হয়ে যায় হিমালয়ের পদমূলে। ওরা এখন শুকিয়ে গেছে। ইতস্ততঃ কয়েকটি ফুল এখানে ওখানে ফুটে রয়েছে। কোথাও কোথাও ছোট ছোট ঝোপ। মাটিতে পড়ে রয়েছে কয়েক স্তরে শুকনো পাতা। পা দিলে সড়সড় করে সরে যায়। তার মধ্য থেকে শ'য়ে শ'য়ে পাখি উড়ে যায়। পাতার মধ্য থেকে খুঁটে খাচ্ছিল পড়ে থাকা ফুলের বা ঘাসের বীজ। নিজেদের অপরাধী মনে হয়। মনে হয়, ওদের বিরক্ত না করলেই পারতাম। বুগিয়ালের মধ্য দিয়ে আবার এগুতে থাকি। একটু পরেই দূরে দেখতে পাই সবাইকে। তপনের গতিও দ্রুত হয়।

পৌঁছে গেছি বালৌনী টপ (১৪০০০ ফুট)। মাত্র চার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে সাড়ে তিন হাজার ফিট উঠতে হয়েছে। তপনের ক্ষিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। বুগিয়ালের পর থেকেই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে

উপরে উঠে যাওয়া। মাঝে মাঝেই বরফ। বালৌনী টপে দাঁড়িয়ে দেখছি হিমালয়ের সৌন্দর্য্য। ডান দিক থেকে বাঁয়ে তাকালেই দেখা যাচ্ছে সুন্দরডুঙ্গা হিমবাহ (১৪৪০০ ফুট), নন্দাকুণ্ড (১৪৫০০ ফুট), নন্দাকোট (৬৯২৬ মিটার), মৃগথুনি, পানওয়ালী দুয়ার (২১,৮৬০ ফুট), থারকোট (৬০৯৯ মিটার), মাইকতোলী (২২৩২০ ফুট), শুকরাম গলি (১৩০০০ ফুট), বালজৌরী (১৯৮৫৭ ফুট) এবং আরও যে কত নাম না জানা গিরিশৃঙ্গ ! চোখের সামনে উন্মোচিত আজ নিখিল বিশ্বের মহাবিস্ময় হিমালয় !!

পরিমল ততক্ষণে বরফ দিয়ে শিব গড়তে শুরু করেছে। অমর রাম পরিপূর্ণ ভক্তিতে ধূপ ও মোম জ্বালিয়ে সুজির ভোগ দিয়ে পুজো করছে। বীরু ভুলে গেছে পায়ের যন্ত্রণা। রবিন খালি ধারের কথা ভুলে শুধুই পাওয়ার আনন্দে মশগুল। মণিদার কণ্ঠ থেকে সুর বেরুতে চাইছে। সত্যেন আর তপনের আনন্দ দেখে কে ?

তপনকে জিজ্ঞেস করি, "এখনও গাল দিবি তো ?"

একগাল হেসে উত্তর দেয়, "আর কুছ নেহি বোলেগা। দিল ভর গিয়া। এইসা জীবনে কভি নেহি দেখা।"

এই তো হিমালয়। সব দীনতা, মলিনতা, তুচ্ছতাকে ভুলিয়ে দিয়ে শাশ্বত প্রেমিক করে দেয়। তাই বারবার আসতে হয় তাঁরই পদপ্রান্তে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে। আমরাও এসেছি। দাঁড়িয়ে আছি হিমালয় অঙ্গনে।

বেলা এগারটা বাজতেই কুয়াশায় ঢেকে গেল শৃঙ্গগুলি। আমাদের এবার নেমে যাবার পালা। নামার সময় সবটাই উৎরাই পথ। প্রায় কোন কষ্ট নেই।

কাঠালিয়ায় আজ এক নতুন দল এসেছে আলমোড়া থেকে। তাঁবু, আইস্ এক্স সবই আছে। হিংসা হচ্ছে ওদের প্রস্তুতি দেখে। কিন্তু ওরা ভাল করে আলাপ করার ভদ্রতাও দেখাল না। অবশ্য দুঃখ করার কিছু নেই। এরা সুসজ্জিত। আছে সব উপকরণ। হয়তো এই

অভিযানের জন্য পেয়েছে সরকারি টাকা। ওদের কৌলিন্যে বাধবেই তো আমাদের মত সামান্য পদযাত্রীর সাথে সহজভাবে আলাপ করতে।

"সেবার কী হয়েছিল মনে নেই? সেই যে···হরিদ্বারে?"—মণিদা মনে করিয়ে দেন।

চারধাম ও গোমুখ দেখে হরিদ্বারে বিশ্রাম করছি। দু'দিন থাকব। বিকেলে মিষ্টির দোকানে আমাদের সামনের টেবিলে বসলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক। সপরিবারে। আগ্রহ নিয়ে আলাপ করলেন। শুনলেন আমাদের অভিজ্ঞতার কথা। এইসব দুর্গম জায়গায় ঘুরে বেড়াই জেনে আরও বেশি মুগ্ধ। আমন্ত্রণ জানান ওঁদের হোটেলে যাবার জন্য। একটি নামী হোটেলে উঠেছেন ওঁরা। কিন্তু ঐসব জায়গায় যেতে আমাদের বড় অনীহা। তাই সবিনয়ে জানাই, "আমাদের তো সময়ের কোন ঠিক নেই।"

—ঠিক আছে। আমরাই যাব। আপনারা কোথায় উঠেছেন?

—গোরক্ষনাথ আশ্রমে।

—আশ্রমে!

—ঐ তো। যেখানে মনসা মন্দিরের সিঁড়ি শুরু হয়েছে, তার পাশে। সুন্দর আশ্রম। মন্দিরও আছে।

ভদ্রলোক মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কিছু খাবারের অর্ডার দিলেন। আমাদের আর চিনতেই পারলেন না। মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল, "ন্যাষ্টি"। খাবার না আমরা কে জানে?

কাঠালিয়ার আকাশে আজ সপ্তমীর চাঁদ। হিমেল রাতে জ্যোৎস্নায় সর্বাঙ্গ মেখে সুন্দরী সুন্দরডুঙ্গা আজ অভিসারিকা। বাইরে বসে দেখছি এই অপরূপাকে।

১১ই অক্টোবর। আমরা ফিরে চলেছি জাতোলীতে। সবার মনেই রয়েছে সেই গিলা পাহাড়ের ধ্বস পার হবার দুশ্চিন্তা।

দ্রুতগতিতে আমাদের পার হয়ে গেল আলমোড়া থেকে আসা গতকালের দল। জানতে চাই, ওরা মাইকতোলী কেন গেল না।

বলল, মাইকতোলী দেখে সোজা চলে এসেছে। কি করে সম্ভব! একটু পরেই ওদের গাইড এল। তার কাছে জানলাম যে পাহাড়ের গা থেকে বরফ পড়তে দেখেই সবাই কাঠালিয়া থেকেই ফিরে এসেছে। ভাবি, না যেতে পারার লজ্জা ঢাকতে হিমালয়ের এই নিভৃতেও কেন মিথ্যা বলা? আরও ভাবি, ওদের তো প্রয়োজনীয় সব উপকরণই ছিল, তবুও কেন ওরা ব্যর্থ? হিমালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছাড়া তাঁর সান্নিধ্য কি পাওয়া যায় না? তাই তো বারবার আসি উপচারহীন প্রাণের নৈবেদ্য সাজিয়ে তাঁরই পদপ্রান্তে এবং সৌভাগ্য যে কোনদিন হিমালয় আমাদের বিমুখ করেন নি।

প্রায় তিন ঘন্টা বৃষ্টিতে ভিজে পৌঁছেছি জাতোলীতে। কিন্তু কারও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মহা আনন্দ। যেন ফিরেছি নিজের ঘরে। সত্যেন তো গানই ধরে বসল "ও ভোলা মন, তোমায় বোঝাই কেমনে?"

১২ই অক্টোবর। অন্যদিনের মতই স্বচ্ছ আকাশ নিয়ে ভোর হল। আজ পথ অনেক সহজ। খাতি যেতে প্রায় সবটাই নামব। নিশ্চিন্তে চলেছি সবাই। ওয়াচ্ছামে গৃহস্থ ঘরে একটু বিশ্রাম। খাতিতেও পৌঁছে গেলাম এক সময়। আজ খাতিতে অনেক যাত্রী রয়েছে। দুখানা ঘর পাওয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যেও হল। অমর রামের বিব্রত উপস্থিতি। কি ব্যাপার? ওর ব্যাগে পরমানন্দর লাল রঙের টর্চ ছিল। সেটা পাচ্ছে না। আবার ফিরে যেতে চাইছে ওয়াচ্ছাম। ওর ধারণা, বিশ্রাম নেবার সময় ব্যাগ থেকে কেউ চুরি করেছে। এখানেও চুরি! ভাবতে খারাপ লাগে। ওকে বিরত করি। নিশ্চয় কোন বাচ্চা ছেলে লাল রঙ দেখে খেলার জিনিস মনে করে নিয়েছে। অমর রাম কিন্তু নিজের গাফিলতির জন্য স্বস্তি পাচ্ছে না।

খাতিতে আজ খাবার সময় রান্নার প্রশংসা করে ফেলেছি। অতএব আরও নিতেই হবে। অমর রামদের বারবার বলি যে ওদেরটা যেন আগে রেখে দেয়। বলে, ওদেরটা আছে। খাওয়া শেষে গিয়ে দেখি

ওদের জন্য কিছুই নেই। লজ্জিত হই, বিরক্ত হই। ওরা নির্বিকার। আমরা যে তৃপ্তি করে খেয়েছি, এতেই ওদের আনন্দ। বলে, "আভি বানা লেঙ্গে।" পরমানন্দ বসে থাকে। ওদের না খাইয়ে আর নড়বে না। তাতেও অমর রামদের অস্বস্তি। সারাটি পথ এই ক'দিন প্রচণ্ড খিদের সময়ও রান্না করে আমাদের পথ চেয়ে অপেক্ষা করেছে খাবার নিয়ে। কোথাও কেউ এক টুকরোও খায়নি যতক্ষণ না আমাদের খাওয়া শেষ হয়েছে।

"বাড়ির কথা মনে পড়ছে?"—সাথী জানতে চায়।

"কেন? হঠাৎ এ প্রশ্ন?"—বিস্ময়ে তাকাই।

—খাবার নিয়ে এমনি স্নেহময়ী অপেক্ষা?

—কেন মনে করাও? সেখানেও তো বিনিময়।

সাথী করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে। মুখ ঘুরিয়ে নিই। কিন্তু ভাবনা থামে না। ভাবি অমর রামদেরই কথা। এরা পাহাড়ি, গাইড, কুলি। পয়সার বিনিময়ে মোট বয়। অপরিচ্ছন্ন ছিন্ন পোষাক। তবুও এদের ছোট ভাবার অবকাশ আছে কি? কত যাত্রী এদের সাথে সামান্য সহানুভূতির কথাও বলে না। ঠিকমত ওদের প্রাপ্য টাকা দেয় না। খাবার দিতে চায় না। দিলেও হিসেব করে দেয়—যা যথেষ্ট নয়। এই বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রীদের তারপরও যত্ন নিতে কোন কুণ্ঠা নেই। নিজের জীবন যায় যাক কিন্তু যাত্রীরা যে ওদেরই উপর নির্ভর করে পথে বেরিয়েছে। মেহমানের সঙ্গে কি নিমকহারামী করা যায়? এদের কথাই ভাবি কিন্তু সভ্য-অসভ্যের সীমারেখা খুঁজে পাই না। অমর রাম বলে, "সাব! আপলোগকা সাথ যেইসে দোস্তিমে চল রহা, বরাব্বর ইয়াদ রহেগা।"

রাত। হাসিমুখে রূপ সিং এসে হাজির। জাতোলীর রাতের মত গান গাইবার জন্য অনুরোধ করি। বেদনায় ভরা হাসিমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অমর রাম রাতে শোবার আগে আগামী দিনের প্রোগ্রাম জানাতে

আসে। আজ আমিই ওর ডায়লগ বলে যাই। হাসতে থাকে। তারপর জানায় কাল পিণ্ডারীর পথে ফুড়কিয়া পর্য্যন্ত যাবার পরিকল্পনা। তার পরই বলে, "লিডার সাব! আজ রাতমে রূপ সিংকো পেমেণ্ট কর দো। কাল উসকো ছোড় দেঙ্গে।"

সবাই চমকে উঠি। আমাদের দল থেকে একজন চলে যাবে! তাই তো কথা ছিল। কিন্তু কথাই কি সব? এই ক'দিনে যে আমরা বন্ধু হয়ে গেছি। আমরা একাত্ম হয়ে গেছি। তাও রূপ সিং! ও চলে গেলে কে গান শোনাবে জ্যোৎস্নাঝরা বরফশিখরের দিকে তাকিয়ে? তবু যেতে দিতে হবে। মন চাইলেই আমরা সব ধরে রাখতে পারি না। সবাই চলে যায়। কেউ বেহিসেবির মত—কেউ হিসেব বুঝে। রূপ সিংকেও হিসেব বুঝিয়ে দেওয়া হয়। দেওয়া হল আরও অনেক বেশি। কিন্তু টাকাই কি সব? দিতে কি পেরেছি ওর নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধের প্রতিদান? সত্যিই কি আমরা 'দোস্ত' হতে পেরেছি? সবাই অনুরোধ করি, সকালে আমাদের সঙ্গে খাবার খেয়ে যেন যায়। বিনীত উত্তর আসে, "কাল ভোরে রাণার যাবে ডাক নিয়ে ঐ পাহাড় ডিঙিয়ে। পথে জঙ্গল ও জানোয়ার। একা যাওয়া যাবে না। তাই রাণারের সঙ্গে যাব। দুপুরের পরই পৌঁছে যাব লোহারক্ষেত।"

বাধা দিই না। হিমালয়ের কোলে কত মুসাফির আসছে যুগযুগান্ত ধরে। কেউ হারিয়ে যায়। কেউ বা ফিরে যায় আপন আলয়ে। ক'দিনের পথ চলায় কত লোক বন্ধু হয়। ফিরে গিয়ে তারা কোথায় হারিয়ে যায়। শুধু থাকে স্মৃতি। ভাল লাগার আবেশ। অমনি করে পাব বলেই আবার বেরিয়ে পড়ি পথে। ঘুরে ফিরি নদীর কিনারায়, জঙ্গলের গভীরে, পাহাড়ের না-জানা ঠিকানায়।

"এস।"

কে! কে ডাকে? ঘুম ভেঙে যায়। খুব চেনা ডাকে চমকে উঠি। উঠে বসি। এ দিক ও দিক তাকাই। দেখতে পাই না। বন্ধুরা তৈরী হয়ে নিয়েছে। কুলিরা মালপত্র বাঁধাছাঁদা করছে। সাথী

মিটিমিটি হাসছে। বলি, “কে যেন ডাকল।” সাথী ভ্রূ নাচিয়ে বলে, “চেন নি ?”

— চিনেছি বলেই মনে হলো। কিন্তু এখানে ও ?

— হ্যাঁ। সেই। তোমার অভিসারিকা।

একটা বিদ্যুত চমক। রক্তে যেন কিসের দোলা! মন ছুটে যেতে চায়। কিন্তু পিছু হটে। কর্ণপ্রয়াগে সঙ্গম দেখা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। ওর ইশারার ডাক কানে বাজে, “আসবে আমার কাছে ? এস কিন্তু।”

টুং টাং আওয়াজ শুনে ঘর থেকে বার হই। রাণার সেজেছে। তার হাতে ধরা বর্শায় ঘন্টা বাঁধা। পিঠে ঝোলা। ও তৈরী। কত অপেক্ষমান, চিন্তিত, অভিমানীর, প্রিয়-প্রিয়ার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে খবর। এক টুকরো খবর। কিন্তু তার ফল কত সুদূরপ্রসারী। মনে পড়ে, এতদিন হয়ে গেল কোথাও কোন চিঠি লেখা হয় নি। সবাই কি চিন্তা করবে ? কিন্তু তবু লিখতে ইচ্ছে হয় না। সেই গতানুগতিক সমস্যা ও তৈরী করা সুখের কথা আজ আর ভেবে লাভ নেই। টুং টাং আওয়াজের মত স্তব্ধ মৌন হিমালয় নতুন খবরের বোঝা চাপিয়ে দিক ওদের মনে। আমাদের থেমে থাকা চলবে না। ঐতরেয় ঋষির মর্মবাণী ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে, মনের পরতে পরতে “চরৈবেতি চরৈবেতি।” এগিয়ে চল এগিয়ে চল।

রাণার চলেছে। রূপ সিং আমাদের কাছে আসে। কিছু বলতে চায়। পারে না। দু'চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। এগিয়ে চলে রাণারের পিছু পিছু। অনেক না বলা কথা বলে গেল। সামনের পাহাড়ের উপর সবুজ গাছের ফাঁকে, মনের অলি-গলির বাঁকে হারিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল। নির্বাক তাকিয়ে থাকি। যদি অমনি করে হারিয়ে যেতে পারতাম।

“চলিয়ে বাবুজী !” তাপ্পিদেওয়া ঢোলা প্যান্ট, কালো ছেঁড়া কোট, পিঠে হ্যাভারস্যাক, ছোট্ট চেহারার সদাখুশি হিম্মৎরাম সামনে দাঁড়িয়ে।

—অমর রাম, কুশল রাম কাঁহা ?

—ঐ লোগ রাতমে নিকাল গিয়া বাবুজী।

—কাহে ? বেগর পুছকে !

—ঘর কা বন্দোবস্ত করনেকে লিয়ে। যাত্রী কাফি হ্যায়।

ঠিকই তো। কাল খাতিতে প্রচুর যাত্রী এসেছে। সবাই যাবে পিণ্ডারী। দোয়ালী বা ফুড়কিয়ায় থাকার জায়গা বলতে বাংলো। এত লোক থাকবে কোথায় ? আমাদের যাতে অসুবিধে না হয় তাই অমর রাম রাত থাকতেই চলে গেছে। সবার আগে পৌঁছে জায়গা বুক করে রাখবে। সাবলোগকো যাতে তকলিফ্ না হয়।

১৩ই অক্টোবরের বিষণ্ণ সকাল। এগিয়ে চলেছি দোয়ালীর দিকে। খাতি থেকে দোয়ালী ১১ কিলোমিটার পথ। পথ চড়াই-উৎরাই। রাস্তার অবস্থাও ভাল। আজ রোদের তেজও কম। তার উপর রয়েছে রডোডেনড্রন, পাইন, দেওদার গাছের ছায়া। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি।

গাছে গাছে বসে আছে কত প্রজাতির পাখি। কখনও ডাক শুনি, দেখতে পাইনা। কখনও বা চোখের সামনে দিয়ে উড়ে যায়। ভাল করে দেখবার আগেই লুকিয়ে পড়ে পাতার আড়ালে। ঝাঁক বেঁধে কখনও যুদ্ধবিমানের মহড়ার মত একই ছন্দে উড়ে বেড়ায়। কত বিচিত্র তাদের রঙ, উড়বার ঢঙ্। মণিদার দিকে তাকাই। কী পাখি ওরা যদি জানাতে পারেন। মণিদা পাখিদের নাম বলেন, "Brod-bills, Honey-guides, Finfoots, Parrotbills, Mountain Quail Picoides, Himalayensis, Wood Snipe, Bull-finch, Sitta Formosa, Garrulas Laneeolatus।"

"নীলকণ্ঠ পাখি নেই ?—রবিন জানতে চায়।

—সে তো মুসৌরীতে দেখবে। ওকে বলে Yellowbilled Blue Magpie। হিমাচলে বলে Digdal।

—কিন্তু এখানেও যে দেখলাম মনে হল।

—ঠিকই দেখেছ। প্রায় একই রকম দেখতে। নাম Redbilled Blue Magpie।

মণিদা গম্ভীরভাবে এতক্ষণ পাখিদের নাম বলে গেলেন। মন দিয়ে শুনতেই হয়। কিন্তু সত্যেন কতক্ষণ চুপ করে থাকবে? মণিদার সঙ্গে একটু খুনসুটি না করলে হয়? তাই জিজ্ঞেস করেই বসে, "মণিদা, এত সব জানলেন কোথা থেকে?"

মণিদার গম্ভীর উত্তর, "পড়াশুনো করতে হয়।"

অনেকটা পথ আসা গেছে। একটু জিরিয়ে নিলে হয়। নিচ্ছেও অনেকেই। পোর্টার ভগবান, হিম্মৎরাম বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। বনের গাম্ভীর্য্যকে ব্যাঙ্গ করে কিশোরী পিণ্ডারী নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে। ওর রূপ যেন ছলনাময়ীর। দেখেছি কর্ণপ্রয়াগের সঙ্গমে। দেখেছি খাতির কাছে সুন্দরডুঙ্গার সঙ্গে মিলনে। ওর উচ্ছ্বাস বড় ভয়ংকর। সর্বনাশা নেশায় আলিঙ্গন করেছে অলকানন্দা, সুন্দরডুঙ্গা। কিন্তু মোহময়ী পিণ্ডারী নিত্য নব সাজে মাতিয়ে চলেছে সবাইকে। ওর কাছে কেউ অপাংক্তেয় নয়। সবাইকেই ওর আহ্বান, "এস।"

সবাই কি সব সইতে পারে? ওর আলিঙ্গনে ধরা দেওয়া পাথর খণ্ডগুলি লজ্জায় রঙীন হয়ে গেছে। আমরা দেখছি সেই রঙীন পাথরের রূপ। মজা লাগে। ভাল লাগে। নানা রঙের পাথরের উপর দিয়ে, পাশ কাটিয়ে, বুকে বয়ে নিয়ে রঙ্গিনী পিণ্ডারীর পথ চলা। থমকে দাঁড়াই। ও খিলখিল করে হেসে বলে, "এলে তাহলে?"

—এই কি তোমার রূপ? সবার সঙ্গেই তোমার রঙ্গ তামাসা?

—তুমিও এস না!

—তোমার বুকে নামার আমার সাহস নেই। ভয় হয়—যদি হারিয়ে যাই?

—তবে এলে কেন?

—তোমায় দেখতে। শুধুই দেখতে।

হঠাৎ তোড়ে জল এল। কিছু পাথর খসে পড়ল ওর বুকে।

তলিয়ে গেল। আমরা নিরাপদে পুল পার হচ্ছি। পুলের কাঠগুলি বড় নড়বরে। কেবল মনে হচ্ছে পা ফসকালেই তলিয়ে যাব ঐ পাথরগুলির মত।

"ওরা ভালবাসতে জানে।"—চাপা নিশ্বাসের মত সাথীর কথা শোনা যায়।

"তুমি জান না?"—ওকেই জিজ্ঞেস করি।

—না। তুমিও না।

—এ কথা কেন বলছ?

—ভালবেসে হারিয়ে যেতে আমরা কেউ পারি না। ভালবাসার ভান করি। ভাল লাগাকে ভালবাসা বলে চালিয়ে দিই। নিরাপত্তার হিসেব কসি। কিন্তু ওরা?

সাথীর দিকে তাকাই। কিছু জবাব দিতে পারি না। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উপরে তাকাই। দূরে দাঁড়িয়ে হিমালয়ের উচ্চশিখর ঝকমক করে ওঠে। বিচিত্র সংসারের তুচ্ছতা দেখে মৌন হয়ে যায়।

পিণ্ডারীকে কি সবাই পেতে চায়! ওর কাছে সবার যেন আত্মাহুতি দেবার লোভ। ডান পাশের পাহাড় থেকে নেমে আসছে জলপ্রপাত। লাফিয়ে নামছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে। কোমর দুলিয়ে এক পাক নেচে গিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে অন্যের বুকে। সবুজ পাহাড়ের মধ্যে সাদা রঙের জলোচ্ছ্বাস। জলকণা ছড়িয়ে দিচ্ছে আশপাশের গাছের গায়ে। একটানা শব্দ। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। নানা রঙের ছোট-বড় পাথরের উপর দিয়ে পিণ্ডারের বয়ে যাওয়া, সবুজ পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা জলপ্রপাত, দূরে শুভ্র পর্বতশিখর। তাকিয়ে না থেকে উপায় আছে? ঐ জলপ্রপাতের কী অদম্য ইচ্ছা পিণ্ডারের বুকে জায়গা খুঁজে নেওয়ার! জানে ঐ সর্বনাশীর কাছে গেলে ওর আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। তবুও আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। ওর কোলে মিশেই শান্তি। অভিসারিকা আবার জিতে গেছে। জলপ্রপাতকে বুকে নিয়ে নিশ্চিহ্ন করে খিলখিল করে হেসে

ওঠে। আরও বেশি বেগবতী হয়ে এগিয়ে যায়।

পৌঁছেছি দোয়ালীর ডাকবাংলোয়। ২৫৭৬ মিটার উচ্চতায় অরণ্যের মধ্যে সুন্দর বাংলো। ছুটে এল দিল্লির সাউথ পয়েন্ট স্কুলের এক দল ছেলে-মেয়ে। ওরাও যাবে পিণ্ডারী-কাফ্‌নি। দিল্লির এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দেখতে পাওয়া যায় হিমালয়ের প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য জায়গায়। পর্বত-পদযাত্রায়ও। এদের দেখেছি গোমুখের পথে, রূপকুণ্ডের পথে। এমনি করে যদি সারা ভারতের বিদ্যালয়গুলি ব্যবস্থা করতো তাহলে দেশের ছেলে-মেয়েরা শুধু সাজঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ে দেশকে জানত না। জানত প্রকৃত ভারতবর্ষকে। গড়ে উঠত একাত্ম-বোধ। হয়ে উঠত সাহসী ও সহমর্মী। কিন্তু তা স্বপ্নই।

"খানা তৈরী সাব"—স্বরূপ রামের আবির্ভাব।

"গোস্ত পাকায়া"—কুশল রামের সংক্ষিপ্ত সংবাদ।

—এখানে মাংস কোথায় পেলে?

—ভেড়া কেটেছিল, নিয়ে নিয়েছি।

—না জিজ্ঞেস করে যে কিনলে, পয়সা কে দেবে? আমরা তো দেব না।

—মাৎ দিজিয়ে। হামলোগ খিলানে নেহি সক্‌তা?

নিশ্চয়ই পারে। আমরা মোট বওয়ার টাকা দিলে ঘরে গিয়ে ছেলে-মেয়ের খরচ চালাবে যারা, তারাও নিশ্চয়ই আমাদের খাওয়াতে পারে। কিন্তু ওরা জানে, আমরা টাকা দেবই এবং আপত্তিও করব না। এটুকু যদি না বুঝে থাকে তাহলে এই কদিন দোস্ত হয়ে চলছে কি করে? ওদের এই সিদ্ধান্তে সবাই খুশি হই। তপন তো আরও বেশি খুশি। মাংস খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি দেহের শক্তি বেড়ে গেছে—বেশ বল পাচ্ছে।

কিন্তু রান্নার স্বাদটা যেন একটু কেমন কেমন। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল সরষের তেল রয়ে গেছে আমাদের সঙ্গে আসা পোর্টার হিম্মৎরামের কাছে। কুশলরামরা রাত থাকতে বেরিয়ে এসেছে। সঙ্গে যে তেল

ছিল, অর্থাৎ নারকোল তেল দিয়েই রেঁধেছে। স্বাদ অবশ্য মন্দ হয় নি।

"অমর রাম কোথায় ?" — বিস্মিত হয়ে জানতে চাই।

— ফুড়কিয়া চলে গেছে। ঘর ঠিক করতে।

— খাবার খায় নি ?

— সঙ্গে ছাতু আছে। তাই খেয়ে নেবে।

অবাক হয়ে যাই। নিশ্চিন্তে খেয়ে-দেয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলে কিছুই বলার ছিল না। আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য অমর রাম ছুটে বেড়াচ্ছে। সব জায়গাতেই করে রেখে যাচ্ছে সুনিপুণ ব্যবস্থা।

"গাইড হো তো এইসা" — স্বপন মন্তব্য করে। অনিল, কিশোর, বীরু সমর্থন করে। কেই বা সমর্থন করবে না ?

দোয়ালী থেকে এগিয়ে চলেছি ফুড়কিয়ার দিকে। এখনও পাঁচ কিলোমিটার পথ যেতে হবে। দেরি করার উপায় নেই। পথও চড়াই। বেশ চড়াই। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। পাহাড়ের বৃষ্টি বেশ জোরেই হয়। অনেকেরই ওয়াটারপ্রুফ সুন্দরডুঙ্গার পথেই ছিঁড়ে শেষ হয়ে গেছে। এখন উপায় ? কেউ বড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে, কেউ খুঁজছে এদিক ওদিক, যদি কোন আশ্রয় পাওয়া যায়। পথের পাশে রয়েছে একটি ওভারহ্যাঙ্। তারই মধ্যে কয়েকজন ঢুকে গেছে। কেউ অনেক আগেই এগিয়ে গেছে। আর যাদের ওয়াটারপ্রুফ আছে তারা ছুটছি যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ফুড়কিয়া পেঁছতে। এই ওয়াটারপ্রুফগুলি পাঠিয়ে দিয়ে সন্ধ্যের আগেই এদের নিয়ে যেতে হবে।

ফুড়কিয়া আর কতদূর ? পথ যে শেষ হচ্ছে না ! বৃষ্টি মাথায় চড়াই পথে দ্রুত চলতে গিয়ে বুকে হাঁপর বাজছে। তবু থামলে চলবে না। দূরে দেখতে পাচ্ছি একজন কেউ যেন দৌড়ে আসছে। কাছে এলে দেখি, অমর রাম। যে কটা বর্ষাতি পেয়েছে, যে কটা পলিথিন সীট ছিল, সব নিয়ে দৌড়ে আসছে। আমার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দেবে। নিচে মিলিয়ে যাওয়া ক্রমে একটি বিন্দুর মত অমর রামের দিকে তাকিয়ে থাকি।

ফুড়কিয়া ডাকবাংলো। উচ্চতা ৩২৬১ মিটার। ঘন গাছপালার মধ্যে ছিমছাম দাঁড়িয়ে। দূরে পাহাড়গুলি কুয়াশার জালে অন্তরীন। এতটা হাঁটার পর আর কিছু দেখবার সামর্থ্যও নেই। ঘরে ঢুকে যাই। অমর রাম ঠিকই ব্যবস্থা করে রেখেছে। ফায়ারপ্লেসে আগুন গনগন করছে। কফির গরম গ্লাস হাত দিয়ে মুঠো করে ধরেছি, তাও গরম লাগছে না ; কিন্তু ঠোঁটে দিলে পুড়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বটে। এদিকে বৃষ্টিতে জুতো মোজা সব ভেজা। পা ঢুকিয়ে দিই আগুনের মধ্যে। গরম হচ্ছে না। কিন্তু জুতো পুড়ে যাচ্ছে খেয়াল নেই। কারও কথা বলার শক্তি নেই। সব চুপচাপ। শুধু বেশি করে কাঠ গুঁজে দেওয়া হচ্ছে ফায়ারপ্লেসে, যতটা আগুনের উত্তাপ বাড়ান যায়।

কেউ কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। কোন্ জিনিস যে কোথায় আছে কে জানে? সবাই অমর রামের খোঁজ করছে, পোর্টারদের খোঁজ করছে। আমার গ্লাভস কোথায়? মোজা কোথায়? সোয়েটার কোথায়? এটা কোথায়, ওটা কোথায়? ওরাও না খুঁজেই বলে দিচ্ছে—ঐ পিঠ্যুর ঐ পকেটে, ঐটা ঐখানে। আশ্চর্য্য ব্যাপার, যেখানে যা বলছে সেখানেই তা পাওয়া যাচ্ছে। এই ক'দিনে জেনে গেছে কে কোনটা ব্যবহার করি। নিজেদেরটা তো নিজেরাই চিনি না। এই ঠাণ্ডায় জবুথবু হয়ে পড়ায় চিনতে পারছিনা, না উচ্চতাজনিত ভ্রান্তি, তাও বুঝি না।

অমর রাম জানিয়ে যায়, "রাত থাকতে বেরুতে হবে। নাহলে সানরাইজ দেখা যাবে না। আমি এসে ডেকে দেব। রাস্তা আচ্ছা হ্যায়। মৌসুম ভি আচ্ছা হ্যায়। চড়াই থোরা থোরা। সিধা আরামসে চলা যায়গা। গুড নাইট।"

অমর রামের ডাকে ঘুম ভাঙে। ঘড়িতে দেখি মাত্র চারটে বাজে। ফুড়কিয়ায় তখনও নিঝুম রাত। আকাশে তারারা ঝিকমিক করছে। শেষ রাতেও কফি হাজির। সবাই তৈরী হয়ে নিই। মন বশে থাকতে চাইছে না। এত দিনের এত কল্পনার আজই পূর্ণ হবার দিন। দেখব পিণ্ডারী হিমবাহকে দু'চোখ মেলে। পৌঁছাব অভিসারিকার কাছে।

যে শুধু ইশারাই করেছে, রূপের ডালি সাজিয়ে দিয়েছে, সঙ্গমে সঙ্গমে মনকে উদ্বেল করেছে, আজ তার উৎসে পেঁছাব। বলব, "তোমারই ডাকে এসেছি সেই কোথা থেকে। কী করবে এবার?"

টর্চের আলোয় পথ দেখে চলা। কোথাও উঠছিই। আবার কোথাও নামছিই। কখনও ঢেউয়ের মত ওঠা-নামা করতে হচ্ছে। একটা জায়গায় অমর রাম নির্দেশ দিল, "এই জায়গাটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাও।" কারণ বুঝলাম না। তবু পার হলাম দ্রুত পায়েই। একশ' গজের মত জায়গা। কিন্তু হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। এমন কেন হল? বাতাসেও কী শূন্যতার সৃষ্টি হয়?

১৪ই অক্টোবর। পিণ্ডারী জিরো পয়েন্টের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি। ফুড়কিয়া থেকে ছয় কিলোমিটার এসেই গেছি। আরও দুই কিলোমিটার পথ বাকি। প্রায় ভোর হয় হয়। দূরে একটি বুগিয়ালের অবয়ব দেখা যাচ্ছে। পথের পাশে আলকাতরা দিয়ে লেখা "পাইলট বাবা" অনেক্ষণ ধরেই দেখছি। বুগিয়ালের মধ্যে একটি গুহা। ওটাই পাইলট বাবার আস্তানা। এখন নেই। আমাদের জলখাবারের আস্তানা হল। বুগিয়ালের মধ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে পরপর দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতচূড়া। বরফের প্রলেপ মেখে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করার সময় নেই। ইচ্ছাও নেই। কাছে এসে দূরে থাকতে কে চায়?

"তুমি আজ খুব আনমনা। কেন?"—সাথী পাশে চলতে চলতে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে।

"তুমিই বা গম্ভীর কেন?"—জিজ্ঞেস করি।

—কই, না তো।

—আমিও নই তাহলে।

অথচ দুজনেই আনমনা ও গম্ভীর। সাথীর মনে কী ঈর্ষা হচ্ছে? ওতো চিরদিন আমার আনন্দেই আনন্দ পায়। আমার কষ্টেই দুঃখী। পিণ্ডার-গঙ্গার ইশারার ডাকে আসাটাকে ও কি পছন্দ করে নি?

পিণ্ডারী 'O' পয়েন্ট। ৩৩৫৩ মিটার উচ্চতায় আমাদের মত

পদযাত্রীদের শেষ সীমানা। এরপর শুরু হবে অভিযাত্রীদের এগিয়ে যাওয়া। যেদিক থেকে উঠে এসেছি সে দিক ছাড়া কোন পথ নেই। নিচে গভীর খাদ। ঘ্যাঁসের মত পাথরকুচির উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পিণ্ডার ক্ষীণ ধারায়। এই মুহূর্তে কে বলবে এই সেই রঙ্গিনী পিণ্ডারী! এইই মোহিনীরূপে কর্ণপ্রয়াগের সঙ্গমে আমায় আহ্বান করেছিল! উচ্ছল যৌবনের ইশারায় আমায় ডেকেছিল সুন্দরডুঙ্গার সঙ্গমে! বার-বার দেখা দিয়ে হারিয়ে গিয়ে আমার মন মাতিয়েছিল! এখানে ঠিক এই মুহূর্তে ও যেন রিক্তা। ফিরে চাইতেও লজ্জা।

"ঠিক এই ভয়ই করেছিলাম। তোমায় বলতে পারি নি। তাই আনমনা হয়েছিলাম।"—সাথীর দিকে তাকিয়ে বলি। বেদনায় সাথীর চোখদুটো ছলছল করে। তাকাই পিণ্ডার-গঙ্গার উৎসের দিকে। প্রায় তিন কিলোমিটার লম্বা ও ১২০০ ফুট প্রস্থের পিণ্ডারী হিমবাহ। তার মধ্যে একটি স্নাউট। প্রায় গোলাকৃতি। তারই ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে পিণ্ডার নদীর ধারা। উৎস মুখ প্রায় ১২০৮৮ ফুট উচ্চতায়।

"কে তার উৎস?"—রবিনের কৌতুহল।

—পিণ্ডারী হিমবাহ। নন্দাকোট, নন্দাখাত ও পানওয়ালী দোয়ার পর্বত শিখর থেকে নেমে আসা বরফ জমা হয়ে এর সৃষ্টি।

—এ নিয়ে কোন গবেষণা হয় নি?

—হয়েছে। এখনও হচ্ছে। সেই ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে যখন কটার ও ব্রাউন প্রথম পিণ্ডারী হিমবাহের স্নাউটের অবস্থান চিহ্নিত করেন, তখন থেকেই এর উপর গবেষণা চলে আসছে। কটার ও ব্রাউন ছিলেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার কর্মচারী। অবশ্য তারও অনেক আগে থেকেই পিণ্ডারীর পরিচয়। এডওয়ার্ড ম্যাডেন এসেছিলেন ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে এসেছিলেন জেনারেল স্ট্যাচে। তিনি পর্যবেক্ষণ করে পিণ্ডারী হিমবাহকে, হিমবাহের গতিবেগ হিসেব করেছিলেন। বলেছিলেন এর গতিবেগ দিনে সাড়ে নয় ইঞ্চি।

জিরো পয়েন্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত ট্রেল পাস। অপূর্ব সুন্দর দেখতে। পেঁজা তুলোর মত বরফের আচ্ছাদনে ঢেকে রয়েছে। ধাপে ধাপে উঠে গেছে। চলে গেছে দৃষ্টি সীমার বাইরে। কত অভিযান হয়েছে এই পাসের উপর দিয়ে। কেউ কৃতকার্য্যে গর্বিত। কোন অভিযাত্রী গেছে চিরদিনের মত হারিয়ে। মহান সৌন্দর্যের কাছে হারিয়ে যাওয়াতেও আনন্দ।

অমর রামরা পুজো দিচ্ছে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে। দমকা হাওয়ায় মোম জ্বালান যাচ্ছে না। নৈবেদ্য বিস্কুট, লজেন্স ও হালুয়া। দেবতারা কত-খানি খুশি জানি না। অমর রামরা খুশি এতেই আমাদের আনন্দ।

কখন যেন সূর্য চুপিসারে উঠে গেছে। দেখতেই পাই নি। কিন্তু দেখছি উঠে পড়া সূর্যের কিরণে ঝলমলে পর্বতশিখর। কী তার রূপ! সব দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। জিরো পয়েন্ট থেকে ডান দিকে তাকালেই ভুলকিয়া। তারপর চোখ ক্রমেই বাঁদিকে ফেরে। একে একে হেসে ওঠে বরকাটিয়া, নন্দাকোট, ট্রেলস পাস, নন্দাখাত, পানওয়ালী দোয়ার, বালজৌরি, ছাংগোছ। এই আটটি বরফের টোপর মাথায় গিরিশৃঙ্গর দিকে তাকিয়ে আমরাও পুজো দিই মনের নৈবেদ্য সাজিয়ে।

এবার ফেরার পালা। এগিয়ে চলি। বারবার পিছন ফিরে তাকাই। আবার দেখা হবে পিণ্ডার গঙ্গার সঙ্গে। কিন্তু আগের সেই অনুভূতি জাগবে কী? সবাই এগিয়ে গেছে দোয়ালী পর্য্যন্ত। ওখান থেকে যাব কাফনী হিমবাহে (১৩১০০ ফুট) ১২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। না থেমেই আবার এগিয়ে চলি দোয়ালীর দিকে।

ঘর নেই। দিল্লির সাউথ পয়েন্টের ছেলেমেয়েরা সব দখল করে আছে। কী করা যায়? সুন্দরডুঙ্গা-পিণ্ডার মিলিয়ে আমাদেরও অনেক হাঁটা হয়েছে। এবারকার মত কাফনী বাদই থাক। তার চেয়ে খাতি ফিরে যাওয়াও ভাল। একদিনে ৩২ কিলোমিটার হাঁটা হবে। তা হোক। ফিরে চলি খাতিতে।

১৬ই অক্টোবর। কাল ঢাকুরি বাংলোয় রাত কাটিয়ে আজ

পৌঁছেছি ভাড়ারি। হোটেলে আস্তানা। মনে শুধুই এই ক'দিনের পদযাত্রার স্মৃতি। আলোচনায় প্রথমেই আসে কুলি-গাইডদের কথা। ওরা আমাদের বিপদের সময় নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছিল। ওরা নিজেরা না খেয়ে আমাদের খাইয়েছিল। ওরা দোস্ত হয়ে গিয়েছিল। ভাড়ারিতে পৌঁছেই প্রত্যেকে নতুন দল পেয়েছে। কাল থেকেই আবার ওরা হাঁটবে। সুন্দরডুঙ্গা-পিণ্ডারীর বুকে অনেক বরফ। উত্তাপে সেও গলে জল হয়ে নামে। আমাদের বুকে জমা বরফও গলতে শুরু করেছে।
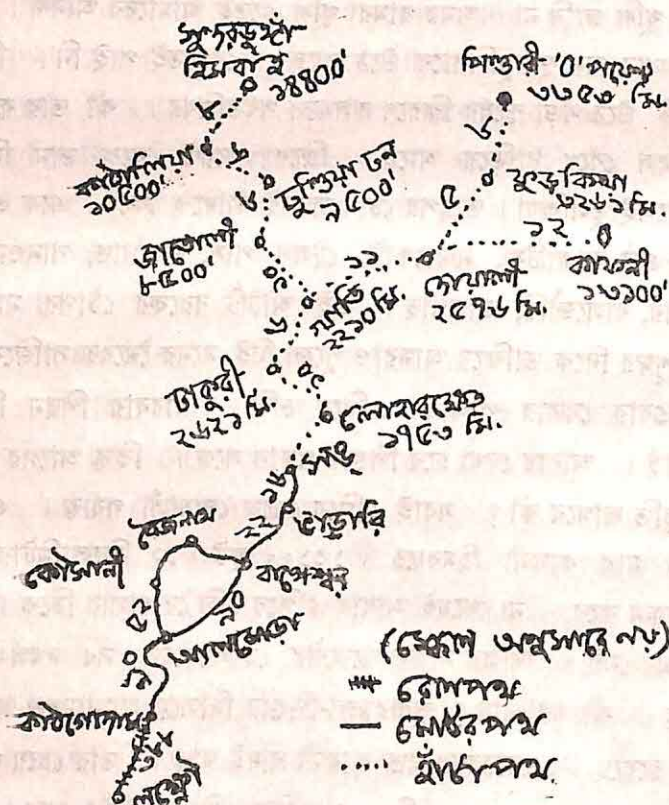
—সুন্দরডুঙ্গা পিণ্ডারী-কাফনী হিমবাহের যাত্রাপথ—

সন্তপথ শতপন্থ

"নর! নারায়ণ!"

কে! কে ডাকে? কী করুণ স্নেহের আকুতি! ধ্যান ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে করুণাময়ী মা। মুগ্ধ বিস্ময়ে নর-নারায়ণ ডেকে ওঠেন, 'মা!'

"ঘরে যাবি না বাবা?"

চমকে ওঠেন দুই ভাই। ঘর? এখনও যে তপস্যা সাঙ্গ হয় নি।

"কতদিন তোদের দেখি না। কী করে থাকি বল তো?" মায়ের অশ্রু বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে।

ক··ত·· দি···ন! তাই তো। অনেক দিনই হবে বোধহয়। নর নারায়ণ দুই ভাই একদিন গৃহত্যাগ করেন। অনেক জায়গা ঘুরে চলে আসেন বদরিকাশ্রমে। তপস্যায় মগ্ন হয়ে থাকেন। সে ভারি কঠিন তপস্যা। কখন যে এক হাজার বছর পার হয়ে গেছে জানতেও পারেন নি।

দেবরাজ ইন্দ্র পড়ে গেলেন চিন্তায়। কী চায় এই দুই তপস্বী? ইন্দ্রত্ব? তা তো হতে দেওয়া যায় না। ঠিক করলেন, যেভাবেই হোক ওদের তপস্যা থেকে বিচ্যুত করতেই হবে। তিনি উৎপন্ন করলেন কাম, ক্রোধ ও লোভ। নর-নারায়ণের উপর প্রয়োগ করলেন তা। বর দিতে চাইলেন। কিন্তু না, কিছুতেই টলান গেল না তাঁদের। ভয় দেখালেন। হিংস্র বাঘ-সিংহ-হাতিকে দিয়ে আক্রমণ করালেন।

সৃষ্টি করলেন ঝড়-বৃষ্টি-আগুনের। তবু না। দুই তাপস নিরুদ্বিগ্ন। কী করা যায়? শেষ উপায় ভাবলেন। ডেকে পাঠালেন অপ্সরাদের, কামদেব ও রতিকে। নির্দেশ দিলেন, "যেমন করে হোক তপস্যারত দুই তপস্বীকে সংকল্পচ্যুত করাতেই হবে। পাবে অনেক পুরস্কার।"

সেদিন গন্ধমাদন পর্বতে অকালে বসন্ত এল। বদরি ফুল-ফলে শোভা পেল বদরিকাশ্রম। শীতল স্নিগ্ধ বাতাস। রম্ভা তিলোত্তমার নৃত্যছন্দে অলকানন্দার জলে মধুর প্রতিধ্বনি। গাছের পাতায় পাতায় ষোল হাজার অপ্সরার সুমধুর সঙ্গীতের ফিসফিসানী। ধ্যান ভাঙল দুই ঋষির।

নর-নারায়ণ বুঝলেন সব। কিন্তু এরা যে অতিথি। আপ্যায়ন করেন কিভাবে? নারায়ণ সৃষ্টি করলেন উর্বশী এবং আরও অনেক অপ্সরাকে। তাঁরা স্বর্গের অতিথিদের পরিচর্যা করবেন।

"আমরা চাই আপনাকে পতিরূপে সেবা করি।"—বলল স্বর্গ থেকে আসা অপ্সরারা।

"তা হয় না। আমি তপস্যা ভঙ্গ করতে পারি না। তোমরা স্বর্গে ফিরে যাও।"—বললেন নারায়ণ।

"স্পর্শ সুখই স্বর্গসুখ। আপনি আমাদের সেই সুখ দিন।"

চমকে ওঠেন ঋষি নারায়ণ। এ তিনি কী করেছেন! কি প্রয়োজন ছিল এদের আতিথ্য দেবার? কেন মৌন থাকতে পারেন নি! কেন হল এই অহঙ্কার? কেনই বা সৃষ্টি করলেন উর্বশীকে? এখন এদের বিদায় করেন কি ভাবে? রেগে শাপ দেবেন? সেও তো এক রিপু—ক্রোধ। তারও পরিণাম ভয়াবহ।

ভাইয়ের অবস্থা দেখে নর মুচকি হাসলেন। মনে পড়ে আরও আগের ঘটনা। সেইবারও ক্রোধবশে এক হাজার দিব্য বছরের তপস্যা নষ্ট হয়েছিল।

নৈমিষারণ্যে নর-নারায়ণ দুই ভাই তপস্যারত। কিন্তু তাঁদের কাছেই ছিল দিব্যাস্ত্র—অক্ষয় তীর ও ধনুক। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর

মৃত্যুর পর প্রহ্লাদ হলেন রাজা। তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে প্রহ্লাদও এলেন নৈমিষারণ্যে। দেখলেন তপস্যারত দুই ঋষিকে। ঋষি অথচ সঙ্গে ধনুর্বান! এ কেমন ঋষি! এ তো অধর্মাচরণ! তীর্থস্থানে অধর্ম হতে দেবেন না তিনি। তাই প্রহ্লাদ নর-নারায়ণকে কারণ জানাতে বললেন। নর-নারায়ণের রাগ হল। ব্রাহ্মণের কাজের কৈফিয়ৎ চান দৈত্যকুলপতি! ওকে উচিত শিক্ষা দিতে চান।

শুরু হল যুদ্ধ। ভীষণ যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ দেবতারাও দেখেন নি কোন দিন। দিব্য সহস্র বছর ধরে চলল সেই যুদ্ধ। কেউ কাউকে হারাতে পারেন না। যুদ্ধ দেখতে এলেন বিষ্ণুও। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে বললেন, "নর ও নারায়ণ আমারই অংশ সম্ভূত। তাই ওদের হারাতে পারবে না কোনদিনই। তুমি পাতালে ফিরে যাও। সুখে রাজত্ব কর।"

প্রহ্লাদ ফিরে গেলেন। কিন্তু দিব্য সহস্র বছরের তপস্যা নষ্ট হল নর ও নারায়ণের। শুধুই অহংকার ও ক্রোধের জন্য। এবারও কী তাই হবে? সেই ভেবেই নর হাসেন। নারায়ণও বুঝতে পারেন। অনুরোধ করেন তিলোত্তমাদের, "তোমরা উর্বশীদের নিয়ে স্বর্গে ফিরে যাও। ইন্দ্রের সুখ বর্ধন কর।"

"যাব। তার আগে আপনি আমাদের পতি হবেন—এই বর দিন" —বললেন স্বর্গ থেকে আসা অপ্সরার দল।

"তাই হবে। তবে এই জন্মে আমরা তপস্যাই করব। দ্বাপর যুগে আবার আমরা জন্ম নেব। তখন তোমরা আমাকে পতি হিসেবে পাবে।"—বললেন নারায়ণ।

দ্বাপরে তাই হয়েছিল। বিষ্ণুর অংশ সম্ভূত অর্জুন ও কৃষ্ণই নর-নারায়ণ।

"ফিরে চল বাবা। অ নে···ক দিন যে তোদের দেখি না।" মায়ের আকুল কান্নায় নর-নারায়ণ বিচলিত।

"আমাদের তপস্যা যে শেষ হয় নি মা। তুমি ফিরে যাও। কথা

দিচ্ছি, বছরে একদিন তোমার কাছে যাবই।”—ব’লে তাঁরা পাহাড় হয়ে গেলেন।

বদ্রীনাথ মন্দির যেখানে সেখানে নারায়ণ পর্বত। অলকানন্দার অপর পাড়ে নর পর্বত। নীলকণ্ঠের গা বেয়ে মায়ের অশ্রুধারা ঝরণা হয়ে নেমে আসছে নারায়ণের উপর দিয়ে। সেই ধারাগুলি মিলেমিশে অলকানন্দা হয়ে যাচ্ছে। আমরা অবাক হয়ে দেখছি।

কয়েকবারই গেছি বদ্রীনাথ। ওখানে মানচিত্রে দেখেছি একটি পথ ‘শতপন্থ’। সেবার বসুধারা যাবার পথে দেখা পেয়েছিলাম এক সন্ন্যাসিনীর। তাঁর কাছে পেয়েছিলাম পথ নির্দ্দেশ। জিজ্ঞেস করে-ছিলাম, “পারব যেতে ?”

“কিঁউ নেহি ?”—বলেছিলেন সন্ন্যাসিনী। আরও বলেছিলেন, “বড় তুর্গম পথ, সুন্দর পথ। সঙ্গে জ্বালানি আর খাবার নিয়ে যেও। পথে কিছু পাবে না।”

সেই থেকেই ইচ্ছে ছিল যাবার। কিন্তু কোনবারই যাওয়া হয়নি। এবারও হবে কি না কে জানে ? পথ তো এখনও শুরুই হয় নি।

শুরুর আগেও শুরু থাকে। আমাদের সেখানেই গণ্ডগোল। শুনে-ছিলাম, শতপন্থে যেতে অনুমতিপত্র লাগে। কিন্তু ঠিক কি করতে হয় জানা ছিল না। তবুও একটা আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলাম “Under Secretary, Confidential Section-III, Govt. of U. P., Bidhan Bhavan, Lucknow” এই ঠিকানায়। অনুলিপি পাঠিয়েছিলাম D. M., Chamoli এবং S. D. M., Joshimath, Dist. Chamoli, U. P. কে। তার কি ফল হয়েছে না জেনেই বেরিয়ে পড়েছি। ঠিক হয়, যোশীমঠে গিয়ে পারমিটের খোঁজ নেব। না পেলে এবারও শতপন্থ যাওয়া হবে না।

অগাস্ট ১৯৮৭। আট জনের দল চলেছি। ঋষিকেশ থেকে বাস ধরে সোজা পৌঁছেছি যোশীমঠ। এবার এখানেই প্রথমে নামব। যোশীমঠে থাকাও হয় না কোনবার। তারপর প্রয়োজনও রয়েছে।

পারমিট এখান থেকেই নিতে হবে। মাথায় দুশ্চিন্তা—পাব তো? আস্তানা ঠিক হল জগদ্‌গুরু শংকরাচার্যের মঠে। রাস্তা থেকে উঠেই মঠ। পরিচ্ছন্ন ঘর। পঁচিশ টাকা ঘরের ভাড়া। সুবিধেই হল। নিচেই বাস স্ট্যাণ্ড। কাছেই S. D. M. এর অফিস, হোটেল, শহর সব।

বৃষ্টি…বৃষ্টি ‥বৃষ্টি। অঝোরে বৃষ্টি। দেবপ্রয়াগ থেকেই শুরু হয়েছে। এখনও চলছে। স্থানীয় অধিবাসীরা মহাখুশি। বছরের প্রথম বৃষ্টি। ফসলের সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের তো মাথায় হাত! S. D. M. এর অফিস থেকে জানাল, এখন পারমিট হবে না। বৃষ্টিতে রাস্তা ও দুটি পুল ভেঙে গেছে। এক সপ্তাহ বদ্রীনাথ যাবার পথ বন্ধ। পাণ্ডুকেশ্বর পর্য্যন্ত বাস যাচ্ছে। তাও অনিয়মিত। বসে থেকে লাভ নেই। এই ক'দিনে দেখে এলাম হেমকুণ্ড ও ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ার্স। দেখে আবার এসেছি যোশীমঠে। পারমিট নেওয়াই যে এখনও বাকি।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের একান্ত সহায়ক জানালেন, ওরা আমাদের দরখাস্ত পেয়েছেন। কিন্তু ওতে হবে না। নির্দিষ্ট ফরমে প্রত্যেককে আলাদা দরখাস্ত করতে হবে। দু' কপি এ্যাটেষ্টেড ফটো দিতে হবে। ভারতীয় নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। এ সব এখন কোথায় পাই? ফটো তুলে নিলাম। ফরমের নমুনা দেখে দরখাস্তও করা হল। কিন্তু ফটো এ্যাটেষ্ট কে করে? নাগরিকত্বের পরিচয়পত্রই বা ওখানে কে দেবে? কিন্তু আমরা যে যাবই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকেই বললাম, "আপনিই করে দিন।" হেসে ফেললেন। আলাপ করলেন। সব কিছু নিজ দায়িত্বে করেও দিলেন। সহকারি যোগ্য সহায়তা করলেন। এক দিনেই সব কিছু করে পারমিট দিলেন। "গুড লাক" জানিয়ে জীপে চেপে বসলেন। তাকিয়ে আছি। এমন সব অফিসারও তো আমাদের দেশেই আছে।

ব্যাসের আশ্রম বদরিকা-পুণ্যস্থানে।
তথায় চলহ সবে, থাকি প্রীত মনে॥

আমরা সেই বদরিকাশ্রমে চলেছি। কিন্তু পাণ্ডবদের মত প্রীত হতে পারছি না। ক'দিনের বৃষ্টিতে ভেঙে যাওয়া পুল কিছুটা মেরামত হয়েছে। জায়গায় জায়গায় বাস যখন ধ্বস পার হচ্ছে, দুলতে দুলতে পুল পার হচ্ছে, তখন প্রীতি উবে গিয়ে মনে মনেই বলে উঠছি "বদ্রীবিশাল কী জয়।" সক্ষমতায় না হলেও নিরুপায়ে ভগবানই ভরসা।

বিষ্ণুপ্রয়াগ, গোবিন্দঘাট ছেড়ে এসে বাস দাঁড়াল পাণ্ডুকেশ্বরে। যোগধ্যান বদ্রী মন্দিরের পাশে। কথিত, মহারাজ পাণ্ডু এখানেই তপস্যা করেছিলেন। বাস দাঁড়াতেই জানালায় জানালায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, মেয়ে-পুরুষ আপেলের ঝুড়ি এগিয়ে দেয়। এখানে প্রচুর আপেল ফলে। ইচ্ছা হয়, কিন্তু কিনি না। সামনের সিটে বসা দক্ষিণভারতীয় এক মহিলা কিনলেন। কত কী যে কথা বললেন কিছুই বুঝি না। উনি অন্য কোন ভাষাও বোঝেন না। যখন ভাষা ছিলনা তখনও কাজ হত। এখনও হল। একজনের কাছ থেকে ছুরি চেয়ে নিয়ে আপেল কেটে কেটে হাতে দিলেন। কিন্তু আমি নেব কেন? মহিলা এবার হাত টেনে নিলেন। না খেলে উনিও খাবেন না। 'নেব না' বলায় ওঁর চোখ ছলছল করে। এ যে মাতৃস্নেহ। নিতেই হয়। ছেলের খাওয়া দেখে মায়ের বড় তৃপ্তি। ছেলেকে কাছে না পেলে কি মা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন?

মাতাজীও পারেন নি। তাই নর-নারায়ণ তাঁকে যদিও বললেন, "তুমি ফিরে যাও। কথা দিচ্ছি, বছরে একদিন তোমার কাছে যাবই" —তবুও ভরসা পান না। থাক না ছেলেরা পাহাড় হয়ে তপস্যারত। কাছে থাকলে রোজ অন্ততঃ দেখতে তো পাবেন। তিনি কাছেই থেকে গেলেন। বদ্রীনাথের একটু দূরে মানা গ্রামের কাছে যেখানে সরস্বতী মিলেছে অলকানন্দার সঙ্গে, তারই কিনারায় একটি কুঁড়েতে থেকে গেলেন।

বদ্রীনাথ মন্দিরকে দেখছি। দেখছি তার পিছনে হিমালয়ের অনন্য

শোভা ফ্র্যাঙ্ক. এস. স্মিথের 'The Queen of Garhwals' তুষারাবৃত শুভ্রশিখর নীলকণ্ঠকে। বদ্রীনাথ শহরের মাত্র আট কিলোমিটার পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছে ২১৬৪০ ফুট উন্নতশির নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠই বটে। শিখরদেশ থেকে একটু নিচে কিছুটা অংশ বরফমুক্ত হয়ে আধা-চাঁদের আকারের নীলচে দাগ। যেন কণ্ঠির মালা। সমুদ্রমন্থনের সব বিষটুকু গলায় ঢেলে দেবাদিদেব নীলকণ্ঠ হয়ে গেছেন। স্মিথ সাহেব ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কামেট অভিযানে গিয়ে নীলকণ্ঠকে দেখেই Kamet Conquered গ্রন্থে বলেন, "পৃথিবীর সুন্দরতম পর্ব্বতের একটি।" অনুপ্রাণিত স্মিথ সাহেব ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নীলকণ্ঠ শিখর অভিযান করেন। কিন্তু সফল হতে পারলেন না। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরও চারটি অভিযাত্রীদলের নীলকণ্ঠ জয়ের স্বপ্নও ব্যর্থ হয়। তারপর ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নীলকণ্ঠ শিখরে পৌঁছায় মানুষ—ভারত-তিব্বত সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একটি দল। আমরা নীলকণ্ঠকে দেখছি। নীলকণ্ঠ দেখছে সবাইকে। পাহাড়-তাপস নর-নারায়ণকে, করুণাধারা নিয়ে অপেক্ষমানা মাতাজীকে, আমাদের মত অর্বাচীনকে।

যাব শতপন্থ। চার দিনের হাঁটাপথ। শীতের জায়গা, অথচ আমাদের স্লিপিং ব্যাগও নেই। পথে কোন লোকালয় নেই। থাকার জায়গা গুহা। বৃষ্টি হলে জল পড়ে। তাঁবু থাকা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের তাও নেই। তবু আমরা যাব। যদি সাধু-সন্তরা এইসব উপকরণ ছাড়াই যেতে পারেন, আমরাই বা পারব না কেন? সুতরাং মানা গ্রাম থেকে আসা গাইড হায়াৎ সিং ও পোর্টার বীরু, রণজিত এবং আলম সিংকে নিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নেওয়া হল বদ্রীনাথ থেকে। পথের কোথাও পাওয়া যাবে না কোন খাবার, জ্বালানি বা অন্য কিছু।

ভোরেই শুরু হল পথ চলা। বদ্রীনারায়ণকে বাঁয়ে ও অলকানন্দাকে ডাইনে রেখে এগিয়ে চলেছি মানা গ্রামের দিকে। বদ্রীনাথ থেকে মানা গ্রাম তিন কিলোমিটার। উচ্চতা ৩৪০০ মিটার। ভারতের শেষ সীমান্ত

গ্রাম। রয়েছে ভারত-তিব্বত সীমান্ত প্রহরী ও ভারতীয় সেনা বাহিনীর ছাউনি। এখানেই অনুমতিপত্র পরীক্ষা করা হয়। ক্যামেরা নেওয়া নিষেধ। এই পথ ধরেই ৬০০০ মিটার উচ্চতায় মানা পাস। সেখানে এখন প্রবেশ নিষেধ। অথচ এই পাস দিয়েই পুরাকাল থেকে ভারতের সঙ্গে ছিল তিব্বতের যোগাযোগ। চলত ব্যবসা-বাণিজ্য। খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে চাল, চিনি, ওষুধপত্র, লোহা, বিলাসদ্রব্য নিয়ে ক্যারাভান যেত তিব্বতে। বিনিময়ে ভারতে নিয়ে আসত মুল্যবান পাথর, পশম, শিলাজোত ইত্যাদি। এই কাজে যারা ছিল অগ্রণী তারা অধিকাংশই ছিল মানা গ্রামের লোক মার্চা ভুটিয়া।

বহুকাল আগে তিব্বত থেকে আসা তিনটি দল ভারতের তিনটি অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। তাদের বলা হয় পাহাড়ের লোক—ভুটিয়া। একটি দল বিভিন্ন গিরিপথ দিয়ে এসে কুমায়ুনের মিলাম হিমবাহ অঞ্চলে গৌরীগঙ্গার তীরে বসবাস শুরু করে। তাদের বলা হয় জোহরী ভুটিয়া। আর একটি দল আসে লিপুলেখ গিরিপথ হয়ে। কালী নদীর তীরে বসবাসকারি এই দলটি হল কালী ভুটিয়া। যে দলটি মানা ও নিতি গিরিপথ দিয়ে এসে এই অঞ্চলেই থেকে গেছে তারাই মার্চা ভুটিয়া।

ভারত-তিব্বত পথ বন্ধ হল। মার্চারা চাষ-আবাদ করে। কঠোর পরিশ্রমে ফসল ফলায়। ভেড়া-বক্‌রি নিয়ে চারণভূমিতে ঘুরে বেড়ায়। অবসর সময় কাটে নাচে গানে। নৃত্য-গীত এদের বড় প্রিয়। হবেই বা না কেন? এরাই তো গন্ধর্ব। কিন্নরী ও গন্ধর্ব-কন্যার আকর্ষণীয় বর্ণনা তো মহাভারতের জায়গায় জায়গায়। আমরা চলেছি সেই গন্ধর্বলোকে। ভাবা যায়!

"তোমরা কেউ সাদী কর নি!"—পোর্টার বীরু শুনে তো অবাক। সবার মত ওরও প্রশ্ন, "কেন?"

"লেড়কি নেহি মিলা"—জবাব দিই।

"এখানে করবে? খুবসুরত লেড়কি পাবে।"

"গান্ধর্বী!" ভাবতেই রোমাঞ্চ জাগে।

"সাদীর পর কিন্তু এখানেই থাকতে হবে।"

সে আবার কি? এখানে থেকে খাব কি? এখানে পুরুষকে নারীদের পরিচালনাধীন থাকতে হয়। মেয়েরাই সব কাজকর্ম করে। মনপ্রাণ দিয়ে পুরুষকে সেবাযত্ন ও পরিচর্যা করে। কিন্তু এরা সমতলে যাবে না। পুরুষকেও কাছে রাখবেই। সুতরাং লাঙ্গল বয়ে বেড়াতেই হবে। গন্ধর্ব-কন্যা বিয়ের ভাবনা ছাড়তেই হয়।

মানা গ্রামে পৌঁছবার আগেই একটি ঝুলা পুল। নিচেই অলকানন্দা-সরস্বতী নদীর সঙ্গম। পুল পার হয়ে ডান দিকের রাস্তা চলে গেছে বসুধারায়। এবার আমরা বসুধারা যাব না। পুল পার না হয়ে বাঁ দিকের রাস্তায় এগিয়ে চলি। একটু গিয়েই সাদা রঙের ছোট্ট একটি মন্দির—"মাতা মন্দির"। মন্দিরে অপেক্ষা করছেন নর-নারায়ণের মা। ছেলেরা তপস্যা ছেড়ে বছরে এক দিনের জন্য হলেও আসেন। মিলন হয় মায়ে-পোয়ে। সেই দিন বদ্রীনারায়ণের ভোগ মূর্তি বয়ে এনে বদ্রীনাথের প্রধান পুরোহিত 'রাওল' নিজে এসে পুজো করেন মা ও ছেলেকে একসঙ্গে। তারপর আবার নির্জনে মায়ের অপেক্ষা। তাঁর মন্দিরে কখনও কখনও আসে গ্রামবাসীরা। মায়ের কাছে মানত করে। পুজো দেয়। পুজো দেয় পোর্টার-গাইডরাও আমাদের হয়ে।

এগিয়ে চলি। চড়াই। এই পথে অক্সিজেনেরও অভাব উচ্চতার কারণে। কোন গাছও নেই। ছায়াও নেই। চলতে গিয়ে হাঁপ ধরে যায়। মাথা ঝিমঝিম করে। তবু চলতে হয়। নেশাগ্রস্তের মত চলা। নেশা তো বটেই। পাহাড়ের নেশা। হিমালয়ের নেশা। এই নেশায় কেন মাতি? হিমালয় যে মাতিয়ে দেয়। পায়ে চলার ক্লান্তিতে প্রতি বছরই সিদ্ধান্ত নিই "আর নয়। এবারই শেষ।" তারপর ফেরার পথেই মন ঠিক করতে চায় 'সামনের বছর কোথায়?' একেই কি বলে হিমালয়ের নেশা? হবে হয়তো। তবে হিমালয়ের নেশায় যাকে একবার ধরেছে তার আর ছাড় নেই।

ছাড় থাকবেই বা কি করে? এই যে সীতাবনের উপর দিয়ে যাবার সময় মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছি বসুধারা জলপ্রপাত, না এলে এমন করে কি দেখা হত? কতবারই তো গেছি বসুধারায়। নিচে দাঁড়িয়ে দেখেছি ওর ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কিন্তু দূর থেকে ওকে যেমনটি দেখছি, তাতো আগে কখনও দেখি নি। পর্বতশিখর থেকে সিঁথির মত রুপোলী জলের ধারা নিচে লাফিয়ে পড়ছে। পর্বতের গা বেয়ে নামার ওর সময় নেই। জলকণাগুলি ফোয়ারার মত চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন নীলপরী ডানা মেলে নেমে আসছে। নেশা ছেড়ে গেলে এই সৌন্দর্য্য দেখাও শেষ হয়ে যাবে। তাই বারবার আসি হিমালয়ে। প্রতিনিয়ত এর রূপল বদল দেখতে।

এই রূপ বদলের খেলা দেখতে দেখতেই সীতাবন ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি। পথ চলার সময় এদিক ওদিক তাকান যায় না, যদি পা ফস্‌কে যায়। যদি হোঁচট খাই। কিছু ভাবার সময় কোথায়? একাগ্র মনে পথ চলা। চলতে চলতেই দুপুর হয়ে গেল। পৌঁছে গেলাম রামবন। রামবনেও একটি গুহা আছে। থাকা যায়। গুহার সামনে দিয়ে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে একটি ক্ষীণ জলধারা। এ সুযোগ কি কেউ ছাড়ে? দুপুরের রান্না চেপে গেল। গা ছেড়ে দিয়ে বসতে যাই।

বসা আর হয় না। টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। অলকানন্দার ওপারে ও কী? অলকাপুরী! কালিদাসের মেঘদূতের বিতাড়িত যক্ষ রামগিরি পর্বতে বসে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' প্রিয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যেখানে প্রিয়ার কাছে নতুন মেঘকে দূতরূপে হৃদয়ের বার্তা দিয়ে পাঠায়, এই সেই অলকাপুরী! যক্ষরাজপুরী! রঙ বেরঙের পাথরের পাহাড়। প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ যেন কোন দক্ষ কারিগরের হাতের শিল্প। দূর থেকে মনে হচ্ছে প্রথমেই ফটক। তারপর প্রশস্ত চত্বর। চত্বর পার হলেই বড় বড় সম উচ্চতার রঙিন গম্বুজ। তারপরই যেন অন্তঃপুর, নৃত্যশালা, সঙ্গীত মহল। এখুনি নেচে উঠবে গন্ধর্বের দল। নাচ-গানের

আসরে দেবতারা মুগ্ধ দর্শক। অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার নিয়ে আপ্যায়ন করছেন যক্ষরাজ। হাল্‌কা মেঘেরা ভেসে যাচ্ছে অলকাপুরীর ওপর দিয়ে। পাথরের রঙ গায়ে মেখে ওরাও রঙ বদলায়।

এখান থেকেই কি পাথর নিয়ে গিয়েছিল পাণ্ডবদের রাজমহল বানাতে ইন্দ্রপ্রস্থে ? অসম্ভব কি। বরং সম্ভাবনার কথা ভাবতেই ভাল লাগে। এই পথ তো স্বর্গের পথ বলেও পরিচিত ছিল। তাহলে ছিল পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগাযোগও। এমন রঙ বেরঙের পাথর তো আর কোথাও দেখি নি। হায়াৎ সিং বলে, "এখানে স্ফটিক পাথর পাওয়া যায়।" তাই কি ? খুঁজি। পাই না। কিন্তু দেখতে পাই নারায়ণ-শিলা। ছোট-বড় নানা আকারের। বদ্রীনারায়ণের দ্বারে নর-নারায়ণের পদপ্রান্তে শিলাও নারায়ণ হয়ে গেছে।

লক্ষ্মীবনের পথ। চড়াই আছে। খাদও আছে। সাবধানে চলতে হচ্ছে। মানা থেকে আট কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পৌঁছুই ১২২০০ ফুট উচ্চতায় লক্ষ্মীবনে। চারদিক ঘেরা পাহাড়ের মধ্যে একটি তৃণক্ষেত্র। একটি গুহা রয়েছে। কোনরকমে থাকা যাবে। আজ এখানেই বিশ্রাম। বিকেলের পড়ন্ত বেলা। সূর্য্যের আলোয় পাহাড়-গুলি ঝলমল করছে। কোনটা বরফ-ঢাকা, কোনটা সবুজ, কোনটা বা বিচিত্রবর্ণের পাথরের। একটির তো কোণারকের সূর্য্যমন্দিরের মত পাথরের রঙ এবং মনে হচ্ছে কোন নিপুণ শিল্পী সমস্ত পাহাড়টিতে নিজের শিল্পকীর্ত্তি খোদাই করে রেখেছে।

রাতের লক্ষ্মীবন। ছোট্ট গুহা। আট জনের পক্ষে শোয়া অসম্ভব। তবু শুতেই হবে। মেঝে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের। একপাশ ঢালু হয়ে গেছে। হায়াৎ সিংরা চলে গেছে কোথায় কোন পাথরের ফাটলে। ওখানেই শোবে। রাত বাড়ে কিন্তু ঘুম আসে না। গুহার ছাদে ধুপধাপ করে আওয়াজ হয়। এখান ওখান থেকে ছিটকে আসা ছোট ও মাঝারি আকারের পাথর পড়ছে গুহার ছাদে। তারই শব্দ। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠি। কোথাও কোন পাহাড় থেকে অ্যাভেলান্স হচ্ছে।

নির্জন রাতে তারই প্রতিধ্বনি। মায়াবিনী রাত। প্রতি মুহূর্ত্তে বুনে চলেছে মায়াজাল। উঠে বসি। কম্বল জড়িয়ে বসে থাকি গুহার মুখে। সামনেই বরফসাদা পাহাড়। আকাশের তারার সঙ্গে হাসছে মিটিমিটি।

রহস্যময় হিমালয়। কখন যে কী ঘটে ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। এই যে চোখের সামনে বরফের পাহাড়টাকে দেখছি, তার অন্তরালে কী এবং কেন ঘটছে তা কি জানি? হঠাৎ দেখি, যেন পাহাড়ের একটি চোখ জ্বলে উঠল। ছবিতে যেমন দেখি, দেবতার কপাল থেকে কিংবা ক্রুদ্ধ মুনির চোখ থেকে আগুন বেরিয়ে আসছে—তেমনি আলোর ছটা। যেন বিশাল এক সার্চ লাইটের আলো। এক ঝলক। আশ্চর্য্য হয়ে যাই। এখানে তো কোন জনবসতি নেই। নেই কোন সামরিক প্রহরী। আর অত উঁচুতে মাঝরাতে যাবেই বা কে? কিন্তু আলোটা তো মিথ্যে নয়। পাথরে পাথরে বা বরফের দেওয়ালের ঘর্ষণের আলো তো ছড়িয়ে যাবে, একমুখি হবে কেন? তবে কি ভুল দেখলাম! ঘুমের লেশমাত্র নেই। সজাগ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছি। আবার ঐ আলো। এমনি করে কয়েকবার। বারবার। তারপর বন্ধ হয়ে গেল। কাউকে জাগিয়ে বলতেও পারি না। যে শুনবে সেই তো বলবে, 'আজগুবি।'

দ্বিতীয় দিন। সকাল হতেই আবার শুরু হল চলা। আট কিলোমিটার পথ যেতে হবে। ছোট-বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে চলতে হচ্ছে। এক দুই কিলোমিটারের পরই হিসেব কষছি কতটা এলাম। দুরন্ত চড়াই পথ যেন আর শেষ হয় না। পাহাড়ের পথে মাইলের হিসেব কিভাবে যে করে জানা নেই। মনে হয় সরল রেখায় করে। পাহাড় ঘুরে যেতে তা অনেক বেশি হয়ে যায়।

চলতে চলতে গাইড ও পোর্টারদের কাছে শুনছি ওদের নানা অভিজ্ঞতার কথা। গাইড হায়াৎ সিং অল্পবয়সী ভুটিয়া ছেলে। ভেড়া চরাতে নিয়ে যায় দূর দূরান্তে। পৌঁছে যায় কত অজানা জায়গায়।

হতে হয় নতুন বিপদের মুখোমুখি। এদেরই কেউ এমনি করে নতুন জায়গার সন্ধান দেয়। পরে সেগুলোই দর্শনীয় স্থান হয়ে ওঠে। পথ আর পাহাড় ওদের রক্তে মিশে আছে। অর্থের প্রয়োজনে মেষ চরানোই শেষ কথা নয়। নয়ন-মন-কাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এদেরও হাতছানি দেয়। এরা দুরন্ত, এরা শান্ত। হিমালয়ের পথে এরা যাত্রীর পরম বন্ধু, পরিত্রাতা, হিমালয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

পরপর তিনটি ঝুলন্ত হিমবাহ পার হতে হচ্ছে। বিমবাহর নিচ দিয়ে ফাটলগুলি হাঁ করে রয়েছে। যে কোন সময় হুড়মুড় করে ভেঙে যাবে। তলিয়ে যাবে। দুরুদুরু বুকে পার হচ্ছি। পা পিছলে যাচ্ছে শক্ত বরফে। আড়াআড়ি ভাবে পার হচ্ছি। থামবার উপায় নেই। দলছুট হলে আরও বিপদ।

কিন্তু বীরু আর রণজিত সিংকে দেখছি না কেন! ওরা মালপত্র নিয়ে আগেই চলে গেছে। বীরু নিজেকে বলে কুলি। কোথায় যেন একটা অভিমান আছে। ইন্টার কলেজে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়েছে সংসারের প্রয়োজনে। স্বাস্থ্যবান, হাসিখুসি, সব সময়ই চঞ্চল। রণজিত সিং এখনও কলেজে পড়ছে। চোখে স্বপ্ন—একদিন বড় চাকরি করবে, অফিসার হবে। স্বপ্নের ঘোরে বাস্তবকে অস্বীকার করে না। আমাদের মত যাত্রীদের মাল বয়ে নিয়ে যায়—কুলি! দুজনই দল ছেড়ে বেপাত্তা। কোন দায়িত্ববোধ নেই!

সামনেই শকুননালা। তীব্র তার জলস্রোত। পথ খুঁজি, যদি কোথাও একটু জল কম থাকে। সবাই থমকে দাঁড়াই। কী করব ভাবি। দেখি, পাহাড়ের এক পাশ ঘেঁসে শকুননালার পাশে চুপচাপ বসে আছে বীরু ও রণজিত। বলি, "বীরু! পার হব কি করে? কুছ্ ভি তো করো।"

"ম্যায় কেয়া করুঁ? হাম তো কুলি হ্যায়। গাইডকো বোলো আউর রাম ভজো।"—হাসিমুখে বীরুর উত্তর।

সত্যিই রামচন্দ্রের ভজনা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু বীরু ও রণজিত

ততক্ষণে বড় বড় পাথর এনে জলকে অন্য ধারায় বইয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। পাথরে বাধা পেয়ে জলস্রোত লাফিয়ে উঠছে, ফুঁসে উঠছে। দেখছি বীরুদের। ওরা এরপর কি করবে? পাথরের উপর দিয়ে বরফগলা এক হাঁটু জলের তোড়ে দাঁড়িয়ে একে একে সবাইকে হাত ধরে পার করে দিল। তারপরই আবার উধাও।

শকুননালা পার হয়ে আবার এগিয়ে চলা। কিছুটা গিয়ে গাইড হায়াৎকে যেন একটু চিন্তিত মনে হল। কাছে এগিয়ে এল বীরু। দুজনে কি যেন পরামর্শ করে। তারপর আবার এগিয়ে চলে। চিন্তিত হবে নাই বা কেন? যে পথ ছিল পরিচিত, সেটা ভেঙ্গে গিয়ে অগম্য হয়ে গেছে। তাই গিরিশিরা থেকে আবার নিচে নেমে পাহাড় ঘুরে যেতে হবে। পথ বলতে তো কিছু নেই। শুধু পাথর টপকে চলা কুলি-গাইডদের পিছন পিছন।

আমরা নারায়ণ পর্বতের পিছন দিকে চলে এসেছি। তারও পিছনে নীলকণ্ঠের শ্বেতশিখর ঝলমল করছে। নারায়ণ পর্বত থেকে ঝরণা নেমে এসে একটি সমতল ভূমির উপর বহু ধারায় বয়ে যাচ্ছে। সহস্রধারা। চারদিক পাহাড় ঘেরা সমতল ভূমিতে সহস্রধারার কুলুকুলু ধ্বনি। ছোট ছোট ঘাস ও গুল্মগুলিতে ফুলের সাজ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা রঙের পাথর। পাহারের গা থেকে নেমে এসেছে বরফের ঢাল। বীরু ও রণজিত সিং পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেল কাঠ-বেড়ালীর মত। নেমে এল বরফের উপর স্লিপ কেটে। ওরা খেলা পেয়েছে। আমাদের দলের ছেলেরাও যোগ দিল সেই খেলায়। বরফের উপর পলিথিন সিট বিছিয়ে বসে গা ছেড়ে দেওয়া। মুহূর্তে নিচে পৌঁছে যাওয়া। ভুলে গেল পথের বিপদের কথা, ক্লান্তির কথা, অনাগত ভবিষ্যতের কথা। হিমালয় সব ভুলিয়ে দেয়। একবার ভাবি নিষেধ করি। তারপরই মনে হয় কেন বাধা দেব? এই পৃথিবীর সবাই তো কোন না কোন খেলায় মেতে আছে। ওরা ওদের মত খেলুক। এগিয়ে গিয়ে দু'চোখ ভরে দেখি ওদের পাহাড় পাহাড় খেলা।

সহস্রধারাতেই দুপুরের রান্না চেপে গেল। এই কুলি-গাইডদের কাজের কোন তুলনা চলে না। আমরা পোঁছেই পেয়ে যাচ্ছি চা ও পাঁপর ভাজা। তারপরই খাবার হাজির। শুধু তৈরী ও পরিবেশনই নয়, তক্ষুনি বাসনপত্র পরিস্কার করে ধুয়ে নেওয়া এবং তারপরই পিঠে বোঝা নিয়ে নির্মল আনন্দে পথ চলা। তাঁবু থাকলে সহস্রধারাতে অনায়াসে থাকা যেত। কিন্তু আমাদের এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সহস্রধারার সৌন্দর্য্য জগতে থাকার পর পথও মনে হচ্ছে সহজ অথচ বাস্তবে তা নয়। চলেছি চক্রতীর্থের পথে।

চক্রতীর্থ। ১৪২০০ ফুট উচ্চতায় চক্রাকার সমতল ক্ষেত্র। চার-দিক পাহাড় ঘেরা। গ্যালারির মত ধাপে ধাপে উঠে গেছে পাহাড়ের ঢাল। যেন আধুনিক স্টেডিয়াম। ভাবতে ভাল লাগে, এখানে হয়তো দেবতারা খেলা করতেন আর দেব-দর্শকরা উপভোগ করতেন ঐ গ্যালারিতে বসে। মন তৃপ্ত এক অনাবিল আনন্দে। ইচ্ছে হয় থেকে যাই এখানেই। কিন্তু উপায় নেই, এগিয়ে যেতেই হয়।

বুগিয়াল থেকে উপরে উঠছি। বুগিয়াল ও পাহাড়ের ঢাল ঘাসে ঢাকা। সবুজ ঘাসের কার্পেটের উপর দিয়ে চলেছি। ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে। কারোর গলায় ঘণ্টা বাঁধা। একসঙ্গে অনেক-গুলি ঘণ্টার টিং টুং টাং আওয়াজ যেন নিস্তব্ধ হিমালয়ের বুকে বাদ্যের ঐক্যতান। পাহাড়ি কুকুর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। কোনও মেষ দলছুট হলে তাড়িয়ে এনে দলের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিচ্ছে। দেখতে দেখতে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠছি ঢাল বেয়ে গিরিশিরার দিকে। গিরিশিরার ধারে রয়েছে একটি বেশ বড় গুহা এবং তারই পাশে একটি ওভারহ্যাঙ। এখন মেষপালকদের দখলে। উপায়? থাকব কোথায়?

দুজন মেষপালক ভেড়ার দল নিয়ে গুহায় আছে। ভেড়াও থাকে গুহায় ও ওভারহ্যাঙে। আজ কিছু ভেড়াকে রাতে বাইরে থাকতে হবে। আমাদের জন্য ওভারহ্যাঙটি ছেড়ে দিল। চারজন কোনমতে শোয়া যাবে। বাকি চারজনকে নিয়ে নিল গুহার ভিতর।

ব্যাস্ নিশ্চিন্ত। আজকের মত এখানেই বিশ্রাম। মনেও পড়ছে না মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের বিপজ্জনক পথ চলার কথা, ক্লান্তির কথা। যেন পাঁচতারা হেটেলে আছি এমনই আনন্দ। আনন্দ মেষপালকদেরও। ওদের চা-কফি দিচ্ছি। খাবারের ভাগ দিচ্ছি। অতিথি আসার আনন্দে কি যে করবে ভেবে পায় না। বীরু হতভাগা সেই সুযোগ পুরো কাজে লাগাচ্ছে। নিজের কাজ ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাড়া দিচ্ছে, "জলদি কর, পাণি লাও, বর্তন সাফা কর—ফটাফট।" ওরাও কিছু মনে না করে খুশি মনে করে যাচ্ছে। হাসছে।

কিন্তু হাসছে না আকাশের মেঘ। মুখ গম্ভীর করে রয়েছে। সামনে হাজির বীরু ও রণজিত। টর্চ্চ চাইছে। যাবে এখান থেকে দেড় মাইল দূরে অতি দুর্গম অঞ্চলে এক সন্ন্যাসীর দর্শনে। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে উর্দ্ধবাহু তপস্যারত এক নগ্ন সন্ন্যাসী আছেন। 'নাঙ্গাবাবা' বলে পরিচিত। সাধ যায় যেতে কিন্তু সাধ্য নেই। সারাদিনের চড়াই পথ পার হয়ে শরীর ক্লান্ত। যাওয়া হল না। সন্ন্যাসী দেখা হল না বলে মনে বড় দুঃখ থেকে গেল। মনতোষ হঠাৎই জিজ্ঞেস করে, "আমরাও কী সন্ন্যাসী নই ?"

"তোরা ? সব বিচ্ছু।"—পরমানন্দর মন্তব্য।

"কিন্তু নই বা কেন ?"—পরিমলের দাবি।

তাই তো ? সন্ন্যাসী কে ? সব কিছু ছেড়ে শুধুই কৃচ্ছ্রসাধনে ভগবানের আরাধনা ? মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দর '*The Song of the Sannyasin*' এর ক'টি পংক্তি, "*Have thou no home. What home can hold thee friend ? The sky thy roof, the grass thy bed, and food, What chance may bring, well cooked or ill, judge not. No food or drink can taint that noble Self Which knows itself. Like rolling river free Thou ever be, Sannyasin bold.*"

ওভারহ্যাঙের মধ্যে শুয়ে আছি। শরীরের অর্দ্ধেক উন্মুক্ত আকাশের

নিচে। তীব্র ঠাণ্ডা। রাতে শুরু হল টিপটিপ করে বৃষ্টি। ভাগ্যে ভাল বেশিক্ষণ হয় নি। এখানকার উচ্চতায় শ্বাসকষ্ট একটু হচ্ছে, তবে কাউকে কাবু করতে পারছে না। হঠাৎই গোমড়ামুখে হাসি ফুটল। মেঘ সরে গিয়ে তারারা হেসে উঠল। নিচের বুগিয়ালের উপর অন্ধকারের কালো চাদর, গিরিশিরায় আলো-আঁধারির পাতলা আবরণ আর নীল আকাশে তারাদের আলপনায় সুন্দর সামিয়ানা। কালকের যাত্রার মনোরম প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট।

তৃতীয় দিন। ভোর হল। সবাই উঠে পড়েছে। কাউকে ডাকতে হয়নি। প্রাতঃরাশ সেরে আমরা প্রস্তুত। সব মাল চক্রতীর্থেই রেখে যাচ্ছি। শতপন্থ দেখে আজই ফিরব এখানে। সঙ্গে যাচ্ছে দুপুরে খাওয়ার মত জিনিসপত্র। পাঁচ কিলোমিটার পথ যেতে হবে, তবেই পৌঁছে যাব আকাঙ্ক্ষিত শতপন্থ।

সত্যপথ, শতপন্থ—কেউ বা বলে সন্তপথ। মহাপ্রস্থানের পথ। সাধারণের জন্য নয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ। পাণ্ডবদের পরমসখা শ্রীকৃষ্ণ নেই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উত্তরাধিকারী পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে চললেন মহাপ্রস্থানে। সঙ্গে চললেন চার ভাই ও দ্রৌপদী। দুর্গম পথে চলতে চলতে তাঁদের দেহাবসান হল। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের—নর ও নারায়ণের দ্বাপরের লীলা সাঙ্গ হল। যুধিষ্ঠির এগিয়ে চলেছেন শতপন্থের দিকে। একা। না, ঠিক একা নন। সঙ্গে আছে পথেই জুটে যাওয়া একটি কুকুর। দেবরাজ ইন্দ্র যখন যুধিষ্ঠিরকে রথে চড়তে বললেন স্বর্গে যাবার জন্য, যুধিষ্ঠির কুকুরটিকেও সঙ্গে নিতে চাইলেন। কিন্তু তা কি করে হয়? কুকুর যাবে স্বর্গে! স্বর্গ তো শুধুই ধর্মাত্মাদের জন্য, বিশেষ বিশেষ লোকের জন্য। যুধিষ্ঠির তখন বললেন, "তাহলে আর আমারও স্বর্গে গিয়ে কাজ নেই। আশ্রিত পথের বন্ধুকে ছেড়ে আমি যাব না।" তখন কুকুর নিজরূপ দেখাল। উনিই ধর্ম্ম। যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করছিলেন।

"আমরাও তাহলে দারুণ পুণ্যাত্মা" – সলিল বলে।

"তুমি আবার পুণ্যের কী করলে?"

"না হলে কুকুর আমাদেরও পথ দেখাবে কেন?"

মনে পড়ে সেবারের কথা। যমুনোত্রী থেকে ফিরছি। জানকীবাঈ চটি থেকে একটি কুকুর সঙ্গে চলতে থাকে। কখনও এগিয়ে যায়, কখনও চলে পিছন পিছন। এগিয়ে যাওয়া ছেলেদের সঙ্গে কুকুরও এগিয়ে যায়। আমরা পিছনে পড়ে গেছি। ফুলচটি তখনও অনেক দূর। এক জায়গায় রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটিতে অস্পষ্ট পায়ে চলার দাগ। আর একটি বেশ ভাল পথ। কুকুরটা মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করছে। একবার যাচ্ছে ভাল রাস্তার দিকে, একবার ছুটে আসছে আমাদের দিকে। আমরা পিছিয়ে পড়া দল ভাল রাস্তায় যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই – কুকুরটা অমন করছে কেন? এগিয়ে যাওয়া দলকেও দেখতে পাচ্ছি না। কুকুরটা অস্থির হয়ে ঘেউ ঘেউ করেই চলেছে। একটু বাদে এগিয়ে যাওয়া ছেলেরা ফিরে এল। কী ব্যাপার? ঐ পথটি ভেঙে গেছে। মিশেছে গভীর খাদে। কুকুরের লাফানো, ঝাঁপানো, ডাকাডাকি করে সাবধান করার মানে বুঝতে পারে নি। এবার কুকুরটা আর আমাদের বুদ্ধির উপর ভরসা করতে পারে না। সবার আগে পথ দেখিয়ে এগিয়ে যায়। নদীর উপর ছোট্ট পুল পার হয়ে এক সময় পৌঁছেছি হনুমানচটি। পুলের ওপারে দাঁড়িয়ে কুকুরটি আমাদের নিরাপদে পৌঁছান দেখল। পুল পার হল না। ডাকলাম, এল না। সবাই পৌঁছালে আপন পথে ফিরে চলল। পথে ওকে এক টুকরো রুটিও খাওয়াতে পারি নি।

"ঐ কুকুরটিও নিশ্চয় কোন তপোভ্রষ্ট ঋষি!" মণিদার মন্তব্যের আমরা কোন প্রতিবাদ করি না।

ভাবতে ভাল লাগে, আমরাও আজ চলেছি যুধিষ্ঠিরের পথ ধরে শতপন্থের দিকে। রূপ মনের প্রতিচ্ছবি, স্মৃতি আনন্দময়। এই দুইয়ের মোহে পথ চলা। দুর্গমও সহজ হয়ে যায়। তা না হলে

আমাদের মত দৈনন্দিন আয়াসে থাকা মানুষরা এপথে চলেছি কী করে! চক্রতীর্থের গুহা থেকে বেরিয়ে হলুদ, সাদা, নীল ফুলের মধ্য দিয়ে সবুজ বুগিয়ালের উপর দিয়ে যখন এগিয়ে চলেছি, চলার গতি এমনিতেই বেড়ে গেছে। তারপরই ঢাল বেয়ে উঠে যাওয়া গিরিশিরায়। তখনই মনে হল অত আনন্দের কী আছে? গিরিশিরা থেকে নামতে গিয়েই চক্ষুস্থির। গিরিশিরা থেকে প্রায় দুশ' ফিট নিচে নামতে হবে ঝুরঝুরে মাটির ধ্বস বেয়ে। পথ কোথায়? যেখানেই পা দিই মাটি সরে যায়। পা হড়কে যায়। কী করব ভাবি। আবার এগুই। রণজিত, বীরু, হায়াৎ ও আলম সিং চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে সাহায্যের জন্য। মনে জোর ফিরে পেল সবাই। ওরা পাশে আছে, কত বড় ভরসা। কখনও আলতো করে একটু হাত ধরতেই মন নির্ভয় হয়ে যাচ্ছে।

পোর্টার আলম সিং আর সঙ্গ ছাড়ে না। ওর ঘর রূপকুণ্ডের পথে ওয়ান গ্রামে। আমরা রূপকুণ্ড গিয়েছি এবং ওদের গ্রামের অনেককেই চিনি জানতে পেরে আমাদের ভাবছে আপনজন। ওর মতে রূপকুণ্ডের তুলনায় এ পথ কিছুই নয়। হায়াৎরা মানতে চায় না। কিন্তু আমরা সমর্থন করায় আলম সিং আরও খুশি। সব থেকে বেশি মাল বয়েছে পোর্টার আলম সিং। জায়গায় জায়গায় পৌঁছেই রান্নার মুখ্যভূমিকায় আলম সিং। সহজ, সরল, বিশ্বাসী, পরিশ্রমী, পথের অকৃত্রিম গাড়োয়ালী বন্ধু আলম সিং।

পথ মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। কিন্তু দূরত্ব দিয়ে পথ আন্দাজ করা যায় না। কঠিন চড়াই। প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে প্রায় হাঁটু সমান উচ্চতায়। পাথুরে পাহাড় ভেঙ্গে গিয়ে যেন ভগ্নস্তূপ। তারই উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছি বলাই ভাল। একটার পর একটা পাথরের মাথায় চোখ রেখে পা বাড়ান, এ ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই। একটাই ভাবনা, চলতে হবে। চলেওছি। চড়াইর পরই আবার খাদ, আবার চড়াই। এমনই এক জায়গায় এসে পৌঁছেছি। ঝুরঝুরে মাটি বেয়ে নামা এবং ওঠা। চলার পথ এতই

সংকীর্ণ যে দু'পা একসঙ্গে রাখা যায় না, কিংবা শরীরের ভার দিলেই মাটি সরে গিয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। চিন্তার কথা। কানে এল দীর্ঘদিনের পাহাড়ি পথের সঙ্গী অনিলের কাকুতি, "এই হায়াৎ! তুম না, যেখানে ধ্বস হ্যায়, হামকো শক্ত করে জোরসে পাকড়েগা।"

হায়াৎ সিং তাই করল। সবাই উঠে এলাম। একটু নিশ্চিন্ত। সুতরাং স্বপন এবার বলতে পারে, "অনিলদা, এটা কেমন হিন্দি হল?" অনিল নির্বিকার। বলে, "কেন! ঠিক বলিনি? আরে ভাই, প্রাণের দায়ে যা বলেছি ঐ যথেষ্ট।"

দূরে লাল ধ্বজা দেখিয়ে গাইড হায়াৎ জানাল, "এসে গেছি।" আঃ কী তৃপ্তি! প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে এটুকু পথ আসতে। আমরা পোঁছেছি ১৪৫০০ ফুট উচ্চতায় শতপন্থে। দাঁড়িয়ে আছি শতপন্থ লেকের ধারে। সামনেই পর্ব্বতশ্রেণী সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে দুধসাদা বরফের চাদর বিছিয়ে গিরিপথের মত। একেই বলে 'স্বর্গারোহণী!' যুধিষ্ঠির নাকি এ পথেই স্বর্গারোহণ করেন।

এ কী অপরূপ দৃশ্য! প্রকৃতির এক অবর্ণনীয় মনোরম রূপ। মুগ্ধ হয়ে দেখছি। ডাইনে সুউচ্চ পর্ব্বতমালা সাদা বরফে সর্বাঙ্গ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। পর পর দাঁড়িয়ে আছে চৌখাম্বা, শতপন্থ স্বর্গারোহণী পর্ব্বতশিখরগুলি। তিন পর্ব্বতের পদতলে দাঁড়িয়ে আমরা ক'জন হতবাক। কাজ ফেলে, ঘর ভুলে, বিপদের সম্ভাবনার কথা অগ্রাহ্য করে বারবার আসি হিমালয়ে। কেন? এমনই অপরূপ, শোভার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলব বলেই তো! কখনও কি ভাবতে পেরেছি, এমন দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য হবে? তারই মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ চমকে যাচ্ছি। কারণ, পাশেই গুমগুম শব্দে মাঝে মধ্যে ভেঙ্গে পড়ছে বরফের দেওয়াল। এ্যাভেলান্স। ভেঙ্গে পড়া জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছে নীলাভ দ্যুতি। আস্তে আস্তে আবার সাদা হয়ে যাচ্ছে। সূর্যতাপে শিখরগুলি কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে।

সামনে রয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোট পাহাড়। দেখা যাচ্ছে মাটি ও

ছোট পাথরের মিশেল কেদার পাহাড়ের পেছন দিক। কোথাও কোথাও তারই গা বেয়ে নেমে এসেছে বরফের স্রোত। মাঝখানে দেড় মাইল ঘিরে শান্ত নীলাভ জলের হ্রদ 'শতপন্থ'। পর্ব্বতের ছায়া সরোবরের জলে। মনে হচ্ছে জলের মধ্যেই পাহাড় বসান।

পাহাড়ের ঢালে সরোবরের তীরের জমিতে ঘাসের মধ্যে ফুটে রয়েছে নানা বর্ণের ফুল। হলুদ রঙের ফুলই বেশি। ছোট ছোট পাখি কলকাকলীতে মুখর করে ফুল বিছান ঘাসের মধ্যে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেখেও দূরে যাবার কোন তাড়া নেই। উড়ে উড়ে খেলে বেড়াচ্ছে আপন মনে। হাত বাড়ালেই ধরা যাচ্ছে। মানুষকে ভয় পেতে হয় এমন কথা বোধহয় ওদের কেউ শেখায় নি। সঙ্গের খাবার ছড়িয়ে দিই। খুঁটে খেয়েই কিচিরমিচির করে আনন্দ করে। যেন বলছে, "বেশ খেতে তো! কী মজা।" ওদের দেখছি, দেখছি শতপন্থ লেক, লেকের মধ্যে পাহাড়ের ছায়া, পাহাড়ের উপর মেঘের রঙ বদল, পেঁজা তুলোর মত সাদা বরফের গিরিপথ স্বর্গারোহণী। এই কী স্বর্গ!

ক্লান্ত শরীরে লেকের জলে স্নান সেরে নিলাম। বরফগলা জল। শরীর অবশ হয়ে আসে, কিন্তু স্নানের পর থাকে না কোন শারীরিক ক্লান্তি। গাইড হায়াৎ সিং দলবল নিয়ে মোম ও ধূপ জ্বালিয়ে পুজো দেয়। ওরা বলে, "মানুষের দান করা কত যে সোনাদানা আছে হ্রদের জলে তার ঠিক নেই। এখানে তর্পণ করার বিধি আছে।"

শতপন্থে রয়েছে কয়েকটি গুহা। বাবা কালীকম্বলীর একটি ঘরও আছে। রাত্রিবাস করা যায়। দুপুরের খাওয়া এখানেই সেরে নেওয়া গেল। এবার ফিরতে হবে। স্বর্গ হতে বিদায়।

খেয়েদেয়েই বীরু-রণজিত হাওয়া। মাল বইবে একা আলম সিং। বিরক্ত হয়ে হায়াৎকে জিজ্ঞেস করি, "এ কেমন বেআক্কেলে লোক নিয়ে এসেছ? ওদের কি কোনই দায়িত্ববোধ নেই?" আমাদের রাগ দেখে শান্ত করার চেষ্টা করে আলম সিং, "কই বাত নেহি। হাম সব সামাল

লেঙ্গে।" হায়াৎ সিং আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়েও হাসে না। নির্লিপ্ত হয়ে চলতে থাকে। অগত্যা আমরাও চলি পিছন পিছন।

এ পথে তো আসি নি! পথ অনেক সহজ মনে হচ্ছে। খাদের সমান্তরালে চলেছি। ধ্বসের জায়গাও কম। কী ব্যাপার হল? খেয়াল করে দেখি, পথের এক একটি বাঁকে কেয়ার্ণ করা—পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে পথের নিশানা। কে খুঁজেছে এই পথ! কে লাগাল এই নিশানা? ভাবতে ভাবতেই একটি বাঁকে হঠাৎ হাসিমুখে স্যালুট করে সামনে দাঁড়াল বীরু, "গুড মর্ণিং স্যার।" পাশে রণজিত।

—০—

—শতপন্থের যাত্রাপথ—

আউলি-চিত্রখানার পথে কুয়ারী

গৈরিক বেশ। মুণ্ডিত মস্তক। হাতে দণ্ড ও কমণ্ডলু। মুখে জ্ঞানদীপ্ত আলোর ছটা। বিস্ময়মুগ্ধ দু'চোখ। দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছেন বার বছরের এক বালক সন্ন্যাসী। আসছেন সুদূর দাক্ষিণাত্যের কেরলের কালাডি গ্রাম থেকে। যাবেন হিমালয়ের ব্যাসতীর্থ বদরিকাশ্রমে। পথ নেই, দিকচিহ্ন নেই, লোকালয় নেই। শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্য। বন্ধুর পথ। প্রতি পদে বিপদের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছেন জ্ঞানতাপস। সংকল্প, রচনা করবেন ব্যাসসূত্রের ভাষ্য। দেবাদিদেব শংকরের কাছে চলেছেন সন্ন্যাসী শংকর। কাশী, প্রয়াগ, কান্যকুব্জ, হরিদ্বার, ঋষিকেশ-লছমনঝুলা, দেবপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ হয়ে শংকর এগিয়ে চলেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে কেউ কেউ সঙ্গে চলেছেন। এসে পৌঁছলেন জ্যোতির্ধামে—যোশীমঠে। বসলেন তপস্যায়। ছোট্ট গুহা। চোখ খুললেই মহামহিম হিমালয়ের শ্বেতশিখর।

দাঁড়িয়ে আছি সেই গুহায়। ধূপ-চন্দনের আবেশ করা গন্ধ। প্রদীপে উজ্জ্বল শিখা। একখণ্ড পাথর চন্দনচর্চিত। শরীর যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। কেউ কোন কথা বলতে পারছি না।

একটু পরে বেরিয়ে আসি। আবার উপরে উঠি। দেখি, সামনেই জ্যোতির্মঠ। কাঠের তৈরী প্রাচীন দোতলা মন্দির। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ সযত্ন লালিত ফুলের গাছে সাজান। গাছে আপেল ও নাসপাতি

ঝুলছে। ফলের ভারে ডাল নুয়ে পড়েছে। মরশুমি ফুলের গন্ধ চারদিক মাতিয়ে রেখেছে। ঘুরে ঘুরে দেখি। বাগান, মন্দির পার হয়ে চোখ চলে যায় অনেক দূরে। নীলকণ্ঠের বরফশিখর ঝকমক করে ওঠে।

ধীরে ধীরে উঠে যাই জ্যোতির্মঠের দোতলায়। প্রশস্ত হলঘরে শংকরাচার্যের গদী। কাঠের দেয়ালে টাঙান আছে জ্যোতির্মঠের আচার্যদের তৈলচিত্র—ছবি। পূজারী হাত ভরে প্রসাদ দেন—আপেল ও নাসপাতি। শোনান আচার্য শংকরের জীবন কাহিনী। কান পেতে শুনি। মন দিয়ে অনুভব করি।

জ্যোতির্মঠে থাকা যায় না? কতবারই তো এসেছি যোশীমঠে। কোনবারই থাকা হয় নি। এবার ঘটনাচক্রে যোশীমঠে থাকছি এবং ঘুরেফিরে কয়েক দিন। যোশীমঠে থাকার জায়গাও আছে অনেক—ট্যুরিস্ট বাংলো, ফরেস্ট রেস্ট হাউস, ট্রাভেলার্স লজ, বিভিন্ন হোটেল, গুরুদ্বার, ধর্মশালা। কিন্তু মন চাইছে থাকি এখানেই—শংকরাচার্যের স্মৃতিজড়ান শংকরমঠে। রাস্তার পাশেই তৈরী হচ্ছে নতুন মন্দির। আছে যাত্রীদের ও ভক্তদের থাকবার ব্যবস্থা। প্রতি ঘর পঁচিশ টাকার মত ভাড়া। এখানে থাকার সুবিধেও অনেক। সামনেই বাসস্ট্যাণ্ড, হোটেল, দোকান, বাজার—সব কিছু। তাছাড়া চোখ মেললেই দেখা যায় চার দিকের পাহাড়শ্রেণী। এ সুযোগ কি ছাড়া যায়?

যোশীমঠ। পৌড়ি গাড়োয়ালের চামোলী জেলার মহকুমা শহর যোশীমঠ। প্রাচীন নাম জ্যোতির্ধাম। মনোরম শহর। ঋষিকেশ থেকে সড়কপথে ২৫৬ কিলোমিটার দূরে ১৮৭৫ মিটার উচ্চতায় পাহাড়ঘেরা শৈল শহর যোশীমঠ। প্রাচীনকাল থেকেই চীন-তিব্বত ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের যে কটি প্রচলিত পথ ছিল, তারই একটি যোশীমঠ। প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে দুর্গা মন্দির, নৃসিংহ মন্দির। নৃসিংহ মন্দিরে শীতকালে বদ্রীনারায়ণের প্রতিমূর্তির পুজো হয়।

আশ্রমের মহারাজ বলেন,—জ্যোতির্ধামের রাজা এগিয়ে এলেন পথে। সাদর অভ্যর্থনা জানালেন বালক সন্ন্যাসী আচার্য শংকরকে। অনুরোধ করলেন, যাতে এখানে থেকে যান তিনি। শংকরাচার্য রাজি হলেন। থেকে গেলেন।

কত বছর আগের কথা? মাত্র বার বছরের ছেলেকে আচার্যই বা বলছেন কেন?—মনতোষ আগ্রহভরে জানতে চায়।

সে প্রায় বারশ' বছর আগের কথা। ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথির (মতান্তরে ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া তিথির) মধ্যাহ্নে জন্মগ্রহণ করেন শংকর। পিতা শিবগুরু ও মাতা সতী দেবী (অন্য মতে আর্যাম্যা) ছিলেন শিবের উপাসক। একদিন বৃষ পর্বতে চন্দ্রমৌলিশ্বর শিবের পূজা করে সর্বজ্ঞ পুত্রলাভের প্রার্থনা করলেন। শিব বললেন,—'বেশ। কিন্তু সর্বজ্ঞ হলে সেই ছেলে হবে স্বল্পায়ু। সর্বজ্ঞ যদি না হয়, তাহলে দীর্ঘায়ু ছেলে হবে। ভেবে বল, কী চাও?' শিবগুরু সর্বজ্ঞ ছেলেই চাইলেন। তাই হল। দেবাদিদেব শংকরের অংশে জন্ম বলে ছেলেরও নাম রাখলেন শংকর।

শংকরের তখন মাত্র তিন বছর বয়স। তখনই তিনি মাতৃভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পিতা শিবগুরু মারা গেলেন। মা সতী দেবী শংকরের উপনয়ন দিয়ে পাঠালেন গুরু-গৃহে। সাত বছর বয়সেই ষোল বছরের পাঠক্রম শেষ করে শংকর গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলেন। আট বছর বয়সেই উপাধি পান 'আচার্য'। তাই তো বার বছরের সন্ন্যাসী বালককে আচার্য শংকর বলছি।

মহারাজের গল্প বলা তখনও শেষ হয়নি। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড়ে এ বছরের প্রথম বৃষ্টি। এমন সময় দরজায় উঁকি দিল ধনসিং। এবারকার যাত্রায় আমাদের গাইড। পরনে ফুলপ্যান্ট, গুঁজে পরা একটু হাত গোটান ফুলহাতা জামা, হাফ সোয়েটার, হাতের কব্জিতে ঘড়ি, মাথায় নেপালী টুপি, পায়ে পাম্প-শু, হাতে সিগারেট। আমাদের মালপত্র কতটা আছে জেনে নিতে এসেছে। কাল সেইমত

কুলি নিয়ে আসবে। ওর কথাবার্ত্তায় একটু সন্দেহ জাগে—পথ চেনে তো ঠিকমত? ওর পাহাড়ে চলার কেমন অভিজ্ঞতা জানা নেই। কারণ ও সরকারি নথিভুক্ত গাইড নয়। যোশীমঠের উত্তর প্রদেশ ট্যুরিস্ট অফিসের পাশের এক দোকানদার পাঠিয়ে দিয়েছে।

অনুমোদিত গাইড নিলেন না কেন?—স্বপনের প্রশ্ন।

পেলে তো নেব।—পরমানন্দ জবাব দেয়।

সত্যিই পাইনি। এবারকার যাত্রাপথই বেশ এলোমেলো। সাধারণতঃ গোয়ালদাম থেকে ওয়ান-সুতোল-কণোল হয়ে ট্রেকাররা কুয়ারীর পথে যান। নয়তো রূপকুণ্ড দেখে শিলিসমুদ্র-হোমকুণ্ড হয়ে কুয়ারী পাস যান। রূপকুণ্ড দেখে আমরা ওয়ান-সুতোল-কণোল হয়ে ঘাট থেকে গিয়েছিলাম অন্যত্র। এবারও দেখে এলাম নন্দনকানন (ভ্যালী অফ ফ্লাওয়ার্স), হেমকুণ্ড ও শতপন্থ। দেখে ফিরেছি যোশী-মঠে। আলোচনা হয়, বাসপথে না গিয়ে অনেকটা পথ তো হেঁটেই নামতে পারি। দেখা হবে কুয়ারী গিরিপথ।

কুয়ারী যে যাবে, থাকবে কোথায়? টেন্ট ফেন্ট তো কিছুই নেই। তাঁবু ছাড়া এ পথে চলা মানেই তো দুশ্চিন্তা বয়ে বেড়ান। যাবেই বা কোন পথে?—মণিদা পরমানন্দর কাছে জানতে চান।

—থাকবার জন্য ভাববেন না। পথে গুহা আছে। তারপর শেষের দিকে তো গ্রামই পাব। তপোবন এখান থেকে ষোল কিলোমিটার। দিনে একবার বাস যায়। ওখান থেকে যাওয়া যায় নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারি। তপোবন থেকে কুয়ারীর দূরত্বও কম। পথও আছে। কষ্টও কম হবে।

—তবু চল, একবার খোঁজ নিয়ে আসি। গাইড-কুলিরও তো ব্যবস্থা করতে হবে। নিতে হবে সাত দিনের মত খাবার দাবার।

সুতরাং বেরিয়ে পড়লাম ট্যুরিস্ট অফিসের দিকে। দিন পনের না-কামান দাড়ি-গোঁফ, অবিন্যস্ত পোষাক। সুন্দর সাজান অফিসে ঢুকতেই তো অস্বস্তি। পাহাড়ি পথে হাঁটতে গিয়ে এসব চিন্তার বালাই থাকে না। নাগরিক সভ্যতার মধ্যে এসেই যত চিন্তা। পর্য্যটন দপ্তরের

কর্মীরা স্বাগত জানালেন। পোষাক-আশাক কোন ব্যাপার নয়; মানুষের সদিচ্ছা, আন্তরিকতা ও ভদ্রতাবোধই তো বিচারের যোগ্য মাপকাঠি। আমরাও সহজ হয়ে উঠলাম। জানালাম,—শতপন্থ ইত্যাদি ঘুরে এসেছি। যাব কুয়ারী গিরিপথে। সঙ্গে তাঁবু নেই। যদি কোন ভাল গাইড-কুলির সন্ধান দেন।

কোথা দিয়ে যাবেন ?—অতিথির চেয়ারে বসা সুবেশ এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক জানতে চান। চোখে মুখে আলাপ করার আগ্রহ।

—তপোবন হয়ে। থাকার সমস্যা একটু কম হবে।

—আউলি হয়ে নয় কেন ? এক দারুণ বিউটি মিস্ করবেন ?

—আউলি দিয়ে গেলে যে বেশি পথ হাঁটতে হবে। ডাকোয়ানির আগে থাকার জায়গা কী আছে জানি না যে।

—ঘাবড়াইয়ে মাৎ। যাঁরা এ কদিনে ৯৮ কিলোমিটার পাহাড়ের দুর্গম পথে হেঁটেছেন তাঁরা বলছেন, 'পথ বেশি হবে' ? তপোবন থেকে 'সিরেফ' ১২ কিলোমিটার বেশি হাঁটতে হবে। এখন তো বক্‌রি চরাবার সময়। কই না কই ঝুপড়ি পেয়েই যাবেন।

কিন্তু ভদ্রলোক আমাদের ঐ পথেই বা যেতে বলছেন কেন! ট্যুরিস্ট অফিসের কর্মীও দেখছি আগ্রহভরে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হয়, পাহাড় অঞ্চল এঁর ভালমতই জানা। স্বপ্নালু চোখ। এঁরা আমাদের হিসেবে ক্ষ্যাপা। হোক না কোন বড় চাকুরে কিংবা বড় ব্যবসায়ী নয়তো খ্যাতিমান লোক—নতুন জায়গা বা সুন্দর জায়গার কথা হলেই ক্ষেপে ওঠেন। হয় বেরিয়ে পড়েন, নয়তো অন্যকেও বার করে ছাড়েন।

ভদ্রলোক আরও বলেন,—আউলির সৌন্দর্য্যের কথা তো শুনেইছেন। নতুন আর কী বলব। আউলি ছাড়িয়ে যতই এগুবেন, দেখবেন একের পর এক বুগিয়াল—ঘোরসো, গুলশন টপ, চিত্রখানা। বুগিয়ালের পাশে অরণ্য। এখন মরশুম। হয়তো দেখতে পাবেন ফুলের বাহার। যারাই এ পথে গিয়েছে, তাদেরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে শুনেছি।

এমনটি নাকি আর কোথাও নেই।

আমরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। মনে যাওয়ার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে। এমনি করেই তো একজনের কাছে খবর শুনে গিয়েছিলাম সুন্দরডুঙ্গা। ঠকিনি তো। একটু অসুবিধে হবে? হোক গে। ঠিক করেই ফেলি—যাব আউলি হয়ে কুয়ারী।

ভদ্রলোক হেসে বলেন,—অবশ্য আমি নিজে যাইনি।

আমরাও হেসে ফেলি। কিন্তু নতুন পথে গাইড পাব কোথায়? অফিস থেকে জানাল,—এখানে রেজিষ্টারড্ গাইড নেই। আশপাশে খোঁজ নিলেই কাউকে পেয়ে যাবেন।

সেইমত কাছেই দোকানে খোঁজ নিই। দোকানদার বলল একজন ভাল গাইড পাঠিয়ে দেবে। দিয়েছেও। এই সেই লোক—ধনসিং।

ধনসিংজী! আউলি দিয়ে কুয়ারীর পথে গেছ তো? ক'দিন লাগবে যেতে?—সন্দেহ নিরসন করতে জানতে চাই।

একগাল হেসে ধনসিং বলে,—বহুৎ টাইম গিয়া। ছে' সাত রোজ লাগ যায়গা।

—ছে রোজ, না সাত রোজ? ঠিক সে বাতাও।

—হেঁ হেঁ। ঐসাহি।

এ আবার কি! ঠিক কতদিন লাগবে তাই যে বলতে পারছে না! ঠিক জানে তো পথ? এখানে তো কাউকে চিনিও না। তবুও তো একজন একে জানে বলেই পাঠিয়েছে। এটুকু ভরসা করেই রাজি হয়ে গেলাম। রেট ঠিক হল। পড়াও হিসেবে গাইড নেবে ৪৫ টাকা এবং কুলিরা ৩৫ টাকা। খাওয়া আমরা দেব। ঘাট পর্য্যন্ত গিয়ে বাসে ফিরলেও ফেরার জন্য ট্রেকিং দিনের হিসেবে অর্দ্ধেক রেটে টাকা দিতে হবে। অযৌক্তিক। তবু মেনে নিতে হয়। অজানা পথ। চড়াই-উৎরাই। দুর্দ্দিনের সাথী হবে ওরা। দর কষাকষি করে কি হবে? সুতরাং ঠিক হল যে পরের দিন সকালে সব কেনাকাটা করে গুছিয়ে নিয়ে দুপুরেই হবে যাত্রা শুরু। হিমালয়ের পথে বিকেলে

না চলাই উচিত। কিন্তু উপায় নেই।

বৃষ্টির জোর কমে গেছে। এখনও টিপটিপ করে পড়ছে। ফিরে যাই মহারাজের কাছে। বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। মহারাজের কাছ থেকে ওষুধ নেবে। কবিরাজী জড়ি-বুটি দিচ্ছেন মহারাজ। বসতে বললেন। বসলাম। ভির কমলে হেসে বলেন,—কেয়া দাওয়াই চাহিয়ে বোলো।

হেসে বলি,—কিস্‌সা কা দাওয়াই।

'অন্দর আও'—ব'লে আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। ধবধবে বিছানা। চকচকে মেঝে। দাগশূন্য দেয়াল। সুন্দরভাবে বই সাজান। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যাঁর দিনযাপন, তাঁর ঘরে রঙের বৈচিত্র্য তো থাকবেই না। শুধুই নির্মলতা—শুভ্রতা। ঐ যে হিমালয়—যার পথে কত রঙ, কত বৈচিত্র্য! ধীরে ধীরে উঠে যাও। পেরিয়ে যাও রঙের রাজ্য। তাকাও চূড়ার দিকে। দেখবে শুধুই শুভ্রতা। মলিনতার কোন স্থান নেই। কিন্তু ঐ রঙের রাজ্য পার হতে চাই সাধনা। মহারাজও সাধক। অদ্বৈত মতে বিশ্বাসী সাধক কর্মযোগকেও অস্বীকার করেন না। একটি তৈলচিত্রর দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন,—উনি কে বল তো?

ঠিক বলতে পারি না। চুপ করে থাকি।

একটু থেমে মহারাজ বলেন,—উনিই এই জ্যোতির্মঠের প্রথম আচার্য—তোটকাচার্য। প্রথম জীবনে ছিলেন প্রায় মূর্খ। শংকর শিষ্যদের আলোচনা শুনে জ্ঞান লাভ করেন এবং তোটকাচার্য নামে খ্যাত হন।

শংকরাচার্য তো ছিলেন অদ্বৈতবাদী। তিনি কর্মযোগকে বিশ্বাস করতেন?

অদ্বৈতবাদ কী বলতো?—মহারাজ প্রশ্ন করে মিটিমিটি হাসেন।

কী বলতে কী বলব, তাই চুপ করে থাকি।

উনিই বলেন,—অদ্বৈত অর্থাৎ যাঁর দ্বিত্ব নেই—ব্রহ্ম। ব্রহ্মই ঈশ্বর।

অদ্বৈতবাদ কী? পরমব্রহ্মের সঙ্গে জীবের অভেদ বা একাত্মবোধ— এই জ্ঞান। "সত্যব্রহ্ম জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" তুমি আমি এই দুরকম বোধ আর থাকে না। সবই এক। এই মতই অদ্বৈতবাদ।

—তাহলে আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পুজো করি কেন?

—তারও প্রয়োজন আছে। একত্বই ব্রহ্মের স্বরূপ। সমস্ত দেব-দেবীতে ব্রহ্মেরই প্রকাশ। সুতরাং উপাসনার জন্য দেব-দেবী, মঠ-মন্দিরেরও প্রয়োজন। তাই শংকরাচার্য বহু মন্দির সংস্কার করেন। বহু দেবমূর্তি উদ্ধার করেন। তখনকার দিনেও ভারতবর্ষের চার প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করেন চারটি মঠ—পশ্চিমে দ্বারকাধামে সারদা মঠ, পূর্বে পুরীধামে গোবর্দ্ধন মঠ, দক্ষিণে রামেশ্বরধামে শৃঙ্গেরী মঠ ও উত্তরে জ্যোতির্ধামে জ্যোতির্মঠ—যেখানে এখন তোমরা বসে আছ।

গল্প শুনতে শুনতে সবাই আনমনা হয়ে গেছি। মন চলে গেছে সেই কোন অতীতে—প্রায় বারশ' বছর পিছনে। ভেবে পাইনা কী করে একজন লোকের পক্ষে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে এত কিছু করা সম্ভব! আট বছর বয়সে আচার্য পদবী লাভ করে শংকর বেরিয়ে পড়েন আরও জ্ঞানলাভের আশায়। বার বছর বয়সে বদরিকাশ্রমে এসে রচনা করেন ষোলখানি গ্রন্থ—যার মধ্যে রয়েছে 'অধ্যাত্মপ্রকাশ', 'আর্যাসপ্ততি', 'ভট্টিকাব্যটীকা', 'মোহমুদ্গর', 'শিবানন্দলহরী', 'স্বাত্ম-পূজা', 'শারীরিক ভাষ্যম' প্রভৃতি। সুতরাং অদ্বৈতবাদী হলেও তিনি কি কর্মযোগী নন?

মন্দিরে ঘন্টার ধ্বনি। মহারাজ পূজার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকবেন। আমরা নেমে আসি। কাল চলা শুরু করব কুয়ারীর পথে। সেই চিন্তাও মাথায় রয়েছে।

সকাল হতেই ধনসিং হাজির। সঙ্গে পাঁচ জন নেপালী পোর্টার। এই সময় ওরা আসে মোট বইবার কাজে। আবার পুজোর সময় ফিরে যাবে নেপালে। মালপত্র দেখে নিয়ে চলে গেল।

৭ই আগস্ট ১৯৮৭। দুপুর বারটায় শংকরমঠ থেকে প্রথম দিনের যাত্রা শুরু হল। সাধারণতঃ দুর্গম পথে কোনও দেবমাহাত্ম্য যুক্ত থাকে। মনে মনে সেই দেবতার উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে 'জয়' ধ্বনি দেওয়া যায়। কিন্তু কুয়ারীর পথে দেবতা কোথায়? কাকেই বা 'জয়' বলব? মহামৌনমুখর অবিচল দেবতাত্মা হিমালয়কেই তাই প্রণাম জানিয়ে হাঁটা শুরু করি।

জ্যোতির্মঠকে পাশে রেখে কিছুটা চড়াই পথ। পথের দু'পাশে বসতি। রয়েছে অনেক আপেল বাগান। গাছের ডাল ফলের ভারে নুয়ে রয়েছে। কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে! কিছু ছিঁড়বার লোভ সামলান মুশ্‌কিল। কিন্তু উপায় নেই। কোথায় কে আড়ালে পাহারায় রয়েছে কে জানে? যদি কিছু বলে, সে খুব লজ্জার কারণ হবে। তবুও লোভ দমন করা অসম্ভব। কিছু দূরে মাঠে গরু চরাচ্ছে এক মহিলা। পরিমল তাকেই জিজ্ঞেস করে,—দিদিজী! আমরা খাবার জন্য দুটো আপেল নেব?

মহিলা আমাদের ভাল করে দেখে নেয়। কী বুঝল কে জানে? আপত্তি করে না। বলে,—খানেকে লিয়ে একঠো করকে লে লেও।

অনুমতি পেয়েছে, সুতরাং ওদের আনন্দ দেখে কে! এ ডাল থেকে, ও গাছ থেকে বেছে বেছে পকেটে পুরছে। সোয়েটারের মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। তেড়ে এল একটি লোক, 'কাহে লেতা হ্যায়?' কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। সরল উত্তর, 'দিদিজী নে বোলা।' লোকটি দূরের মহিলাকে দেখে। আর কিছু বলে না। বোঝে, আমরা চোর নই। লুকিয়ে দু'চারটে বেশি নেওয়াকে কি চুরি বলে? টাটকা আপেল-নাসপাতির স্বাদই আলাদা। কামড় দিলে যে রস বেরোয় আমরা বাংলাদেশের লোক কি তা জানি? যেমন মিষ্টি রস, তেমনই সুগন্ধ।

গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার চড়াই ভেঙে পাকা রাস্তা। মিলিটারি ক্যাম্প আছে আউলিতে, তাই ট্রাক ও জীপের আনাগোনা আছে। একটা কিছু পেলে আট কিলোমিটার হাঁটা কমত। ভাগ্য

অপ্রসন্ন। কিছুই পেলাম না। না পেয়ে অবশ্য ভালই হয়েছে। পেলে এমন সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করতে পারতাম না।

চলেছি আউলি। নিচে যোশীমঠ ক্রমেই ছোট থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে আর যোশীমঠ থেকে দেখা পাহাড়গুলির উচ্চতা যাচ্ছে কমে। আমরা উপরে উঠছি। আউলির পথ থেকে যোশীমঠের দৃশ্যও দেখবার মত। যেন শিল্পীর আঁকা ছবি। পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ির মত ধাপ বানান রয়েছে। তাতে লাঙল দিচ্ছে। বৃষ্টি হয়েছে, এবার কৃষিকাজ হবে। এখানে ওখানে গাছে বুনো গোলাপ ফুটে রয়েছে। দূরে দূরে এক আধটা বাড়ি। উঠোনে রোদে পিঠ দিয়ে কেউ শস্য ঝাড়াই বাছাই করছে। কেউ একমনে উল বুনছে। ঐ যে বাংলোর মত সুন্দর বাড়িটি—হয়তো কোন অফিসারের কোয়ার্টার। তারই লনে সুবেশা মহিলা সুদৃশ্য চেয়ারে বসে অলস চোখে আমাদের যাওয়া দেখছেন। উনি এখন একা। সময় কাটাবার জন্য কথা বলারও হয়তো কেউ নেই। আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। হয়তো ভাবছেন—অমনি করে যদি কাঁধে ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে যেতাম! পিচ বাঁধান রাস্তার দু'ধারের গভীর অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে এসব দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। মাঝে মধ্যে উঁকি দিচ্ছে বরফঢাকা পর্বতশিখর। মন কেমন করা আবেশে আট কিলোমিটার চড়াই ভাঙতেও কোন কষ্ট হচ্ছে না। সুন্দরের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলছি। আত্মহারা হচ্ছি।

পৌঁছেছি আউলি। স্বপ্ন রাজ্য আউলি। নন্দাদেবী, কামেট, মানা, দুনাগিরির শিখরগুলি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। জিরিয়ে নিতে চায়ের দোকানে বসেছি। রোদের তেজ কমে আসছে। বইছে ঠাণ্ডা বাতাস। ছোট্ট কুঁড়ের থামে হেলান দিয়ে একটি মেয়ে, কাছেই খুঁটোয় বাঁধা ছাগল, উঠোনে মুরগী—সবাই নিশ্চল দাঁড়িয়ে। যেন ফ্রেমে বাঁধান জীবন্ত ছবি। অমনি করে যদি দিনের পর দিন ঐ বরফশিখরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম!

কিন্তু এখানে তো থাকা হবে না। এক বেলাও নয়। যেতে হবে

আরও এগিয়ে। আউলি বুগিয়াল পেরিয়ে ঘোরসো বুগিয়ালের দিকে। সন্ধ্যের আগেই পৌঁছতে হবে। শুনেছি, ঘোরসোতে একটি গুহা আছে। এখান থেকে ছয় কিলোমিটার হবে। যে করেই হোক ওখানে যেতেই হবে। না হলে থাকব কোথায়?

চিহ্নিত পথ শেষ হয়ে গেছে। এবার শুরু পাহাড় ঘুরে চড়াই-উৎরাই ভাঙার পালা। ক'দিন বৃষ্টির পর বর্ষা দুদিন ধরেছে। কিন্তু আর হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? চেরাইর জন্য বন থেকে বড় বড় গাছের গুঁড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে আসছে আউলির দিকে — অর্থাৎ বিপরীতমুখি যাত্রায় আমাদের বেশ উঠতে হবে। উঠছিও।

বেশ লাগছে চলতে। প্রায় ন'হাজার ফুট উচ্চতায় ঢেউ খেলান আউলি বুগিয়াল। দূরে কয়েকটি লাল রঙের ঘর। স্কি খেলোয়াড়-দের জন্য থাকার ব্যবস্থা। যখন খালি থাকে, সাধারণ যাত্রীরাও থাকতে পারে। আউলি বুগিয়াল শীতের সময় বরফে ঢেকে থাকে। তিন কিলোমিটার জুড়ে সেই বরফের উপর স্কি খেলায় মেতে ওঠে দেশ-বিদেশের খেলোয়াড়রা। রয়েছে শিক্ষণের ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে আউলির স্কি ময়দানের। হবেই বা না কেন? এই উঠছি তো এই নামছি। এমনি বরফের ঢাল মনকে মাতিয়ে তো দেবেই! শুধু বরফের উপর দিয়ে খেলে বেড়ান নয়, পাশের বিশাল বিশাল দেওদার ও স্প্রুস গাছের সবুজ অরণ্য চোখকে স্নিগ্ধ করে। হয়তো তার থেকে বেরিয়ে আসবে ভালুক কিংবা চিতা। একটু ভয় ভয় ভাব তক্ষুনি কেটে যাবে, যখনই উপরে তাকালেই এখানে ওখানে দেখা যাবে বেথারতোলি, নন্দাদেবী, মানা, কামেট, হাতি ও ঘোড়ি পর্বতশিখর। কোথাও রোদে বরফ ঝকমক করছে। কারও গায়ে হাল্‌কা কুয়াশার প্রলেপ। নীল আকাশের বুকে ছোট্ট ছোট্ট সাদা মেঘ এদিক থেকে ওদিকে সরে যাচ্ছে — কোথাও বা স্থির হয়ে রয়েছে।

এখন আউলি বুগিয়ালে বরফ নেই। কবেই গলে জল হয়ে গেছে। বেরিয়ে এসেছে সবুজ ঘাস। যতদূর চোখ যায় শুধুই সবুজের মেলা।

গাছ সবুজ, ঘাস সবুজ, মাঠ সবুজ—দেখতে দেখতে মনও সবুজ। সবুজের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে মনেরও রঙ বদলায়। অমনি চারদিকে প্রকৃতিরও রঙ বদলে যায়—নীল হয়ে যায়, সাদা হয়ে যায়, হলুদ হয়ে যায়, বেগুনী হয়ে যায়, লাল হয়ে যায়। সব রঙ মিলে ফুল হয়ে যায়। সেই ফুলেরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। যেই বাতাস এসে ওদের সঙ্গে রসিকতা করে, ফুলেরা হেসে ঢলে পড়ে। এ ওকে ডাকে —জেন্টিয়ান, প্রোটেনটিলা, প্রিমূলা, বাটারকাপ, ম্যারিগোল্ড কত কী! যাদের নাম নেই তারাও পাপড়ি মেলে ফুটে আছে। হাসছে।

আত্মহারা। টিলার মত পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে দিগন্তজোড়া ফুলের রাজ্যে একা একটি মেয়ে। কাছেই চরে বেড়াচ্ছে কয়েকটি গরু, ছাগল। তাদের দিকে খেয়াল নেই। গাড়োয়াল কন্যার উড়ুনি গা ছেড়ে ফুলের উপর চাদর হতে চাইছে। মেয়েটির হয়ত দিন কাটাবার সমস্যা আছে। হয়ত আছে দারিদ্র্যের ছোবল। সে সব এখন এই মুহূর্তে তুচ্ছ হয়ে গেছে। সেও এই সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে ফুল হয়ে গেছে। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে অনিলও। চোখ সরছে না।

অনিলদা! তুমি যে চোখ দিয়েই গিলে খাচ্ছ।—অনিলেরই প্রায় সমবয়সী পরিমল ঠাট্টা করে।

অনিল হুঁশে ফেরে। মুখ রাঙা হয়ে যায়। রেগে বলে,—একথা কেন বলছ? কি করেছি?

পরিমল থতমত খেয়ে যায়। অনিল যে রেগে যাবে বুঝতে পারে নি। অপ্রস্তুত হয়ে বলে,—না, না, তুমি চোখ ফেরাচ্ছিলে না কিনা তাই। এমনিই ঠাট্টা করছিলাম।

এমন ঠাট্টা আর কক্ষণও করবে না।—ব'লে অনিল হনহনিয়ে হাঁটা শুরু করে। ওর রাগ কমে না।

ছোটভাই! তুমি রাগলে কেন? শরীর ছাড়া কি নারী উপভোগ করা যায় না?—চলতে চলতেই অনিলকে বলি।

--সে আবার কী উদ্ভট কথা বলছ ?

—উদ্ভট নয়। ঘটনা। ইতিহাসের ঘটনা। জীবনের ইতিহাস।

ততক্ষণে দলের সব এক জায়গায় হয়েছি। পাহাড়ের ঢালে ফুলের বিছানায় বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। সবাই একবার তাকাচ্ছে অনিলের দিকে, একবার আমার দিকে। মনতোষ শেষ পর্য্যন্ত বলেই ফেলে,— ঘটনাটা একটু বলেই ফেলুন না।

গল্প বলি। আগেই শুনেছ, মহাদেব বলেছিলেন যে সর্বজ্ঞ ছেলে হলে তিনি স্বল্পায়ু হবেন! পিতামাতা তাই মেনে নেন এবং জন্ম হয় শংকরাচার্যের। এও শুনেছ, মাত্র বার বছর বয়সে আচার্য শংকর আসেন ব্যাসতীর্থ বদরিকাশ্রমে এবং রচনা করেন বিভিন্ন গ্রন্থ। তারপর তিনি যান গঙ্গোত্রী এবং সেখানে মন্দির নির্ম্মাণ করে শিবলিঙ্গ ও গঙ্গাদেবীর মূর্তি স্থাপন করেন। তারপর আসেন উত্তরকাশী। তখন তাঁর বয়স ষোল পার হয়ে সতেরয় পড়বে। মহাসমাধি যোগ। শিষ্যরা চিন্তিত। শংকরাচার্য আত্মসমাহিত। এমন সময় উত্তরকাশীতে এলেন এক ব্রাহ্মণ। তিনি অদ্বৈতবাদ বিষয়ে শংকরের সঙ্গে তর্ক করবেন। শংকরাচার্যের সঙ্গে সাতদিন ধরে তর্ক চলল, কিন্তু কোন মীমাংসা আর হয় না। তখন ব্রাহ্মণ পরিচয় দিলেন—তিনিই ব্যাসদেব। শংকরাচার্যকে পরীক্ষা করতে এসেছেন। তিনি বর দিলেন,—আরও ষোল বছর তোমার আয়ু বৃদ্ধি হোক। এবং নির্দ্দেশ দিলেন,—অন্যমতের পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করে অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা কর।

ব্যাসদেবের নির্দ্দেশে শংকরাচার্য প্রথমে গেলেন প্রয়াগে পণ্ডিত কুমারিলের কাছে। কুমারিল ভট্ট ছিলেন কর্ম্মবাদী। তিনি আগেই বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি মত খণ্ডন করে বৈদিক মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু তিনি তর্কে আর রাজি নন। তিনি সংকল্প করেছেন তুষানলে আত্মাহুতি দেবেন। পণ্ডিত কুমারিল ভট্ট শংকরাচার্যকে বললেন,—নর্মদা তীরে মাহিষ্মতি নগরে আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্র থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডে মণ্ডন মিশ্রই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁকে পরাস্ত করলে অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠায় তোমার আর

কোন বাধা থাকবে না।

কিন্তু শরীর ছাড়া নারীসঙ্গ ব্যাপারটা কি বললেন না তো?—স্বপনের প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই ধনসিং তাড়া দেয়,—চলিয়ে বাবুজী। বহুৎ দের হো গিয়া।

সুতরাং উঠতেই হয়। ছোট ছোট নানা রঙের ফুলে ভরা ঢেউ খেলান বুগিয়াল। এগিয়ে যাওয়া দল দেখতে পাচ্ছি না পিছনের লোকদের। ফুল গাছের মধ্যে হারিয়ে গেছে। চলতে চলতে ফুলের মধ্য থেকে হঠাৎ মাথাগুলি উঠে আসছে। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য! ফুলের রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া—এ তো রূপকথার গল্প। আজ সত্যি হয়ে গেছে।

আকাশে মেঘ নেই, কিচ্ছু নেই—হঠাৎ বৃষ্টি। দুর্ভোগ আর কাকে বলে! অনেকেরই বর্ষাতি রয়েছে কুলিদের পিঠের হ্যাভারস্যাকে। অতএব বড় গাছের নিচে আশ্রয় নিতে হল। একটু পরেই বৃষ্টি থামল। এগিয়ে যাই। পোর্টাররা অপেক্ষা করছে। এবার আর ভুল নয়। বর্ষাতি নিজের নিজের কাছে নিয়ে আবার চলার শুরু।

আউলি বুগিয়াল ছাড়িয়ে ঘোরসোতে পৌঁছতে হবে। আউলি থেকে ছয় কিলোমিটার। আউলি বুগিয়ালের তিন কিলোমিটার পার হয়ে এসেছি। সন্ধ্যে নেমে এসেছে। পৌঁছতে হবে তাড়াতাড়ি। এখনও আশ্রয়ের কোন ঠিক নেই। আবার মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। বর্ষাতি ভেদ করে ভিজিয়ে দিচ্ছে ভিতরের পোষাক। গাছের আড়ালও কোন কাজে আসছে না। তবু তারই নিচে দাঁড়িয়ে আছি। গাছের সঙ্গে গরু বাঁধা। সুতরাং সামনেই নিশ্চয় কোন আস্তানা আছে। কিছু পাথর সাজিয়ে একটি মন্দির। লাল রঙের ধ্বজা বৃষ্টিতে ভিজে নেতিয়ে পড়েছে। পথশ্রমে, ভিজে আমরাও তাই। বৃষ্টি থামছে না। দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ ভেজা যায়? সুতরাং এগিয়ে যাই। একটু গিয়েই একটা ওভারহ্যাঙ। বাঁচা গেল। বৃষ্টির হাত থেকে আগে মাথা তো বাঁচুক।

ছোট ওভারহ্যাঙ। অপ্রশস্ত ও অপরিচ্ছন্ন। ভিতরে কালিমাখা।

বসতে গেলেও কালি লেগে যাচ্ছে। এখানেই রাত কাটাতে হবে? অসম্ভব। এই কি ঘোরসোর গুহা! আপাততঃ বৃষ্টির থেকে মাথা বাঁচান গেছে ঠিকই, কিন্তু রাত কাটাব কি করে? এতগুলি লোক বসে থাকার মতও জায়গা নেই। কি করা যায়? গাছে যখন গরু বাঁধা দেখেছি, নিশ্চয় কাছে পিঠে লোক আছে। কিন্তু কোথায়? খুঁজে নিতেই হবে। পরমানন্দ ও মনতোষ ধনসিংকে নিয়ে এগিয়ে গেল। রাত হবার আগেই যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

অপেক্ষা করছি। কোন খবর আসছে না। অন্ধকার নেমে আসছে। আর অপেক্ষা না করে ওদের খোঁজে এগিয়ে গেল পদম বাহাদুর ও দিল-বাহাদুর। সময় যেন আর কাটে না। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে ভেবে ঘড়ি দেখি। দেখে বুঝি মাত্র পাঁচ মিনিট আগেই ঘড়ি দেখেছি। এমনি করে আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। চিন্তা বেড়েই যাচ্ছে—ওরা আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছে কি? যদি পথ উলটো হয়ে যায় তাহলে তো আরও বিপদ। কি করব ভাবছি। এমন সময় দূর থেকে শিস শোনা গেল। পাহাড়ি পথে পাহাড়িদের অবস্থান সংকেত। অর্থাৎ 'এগিয়ে এস'। আর দেরি করি না। ওভারহ্যাঙ থেকে খানিকটা চড়াই উঠেই দেখা গেল মেষপালকদের সারিবদ্ধ ছাউনি। চলার গতি দ্রুত হয়। বৃষ্টিও থেমেছে। উপর থেকে লোকের কথাবার্তার শব্দ শুনে ঢাল বেয়ে উঠতে থাকি। উঠিও। পৌঁছেছি গুলশন টপ্। কেউ বলে গোরসন টপ। চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। সামনেই দাঁড়িয়ে পরমানন্দ।

এটুকু তো পথ। এতক্ষণ কি করছিলি? খবর দিতে পারিস নি?—পরমানন্দকে সামনে পেয়ে রাগ দেখাই।

—কেন! ধনসিং খবর দেয় নি? ওকে তো এক ঘণ্টা আগে তোদের আনতে পাঠিয়েছি। যায় নি?

—কোথায় ধনসিং? ডাক তো। দেখি কি ব্যাপার।

ধনসিং এল। হাতে হুঁকো। মেজাজে ধোঁয়া ছাড়ছে। জিজ্ঞেস করি,—এতক্ষণ কি করছিলে?

—ঝুপড়িওয়ালাদের সঙ্গে বাতচিৎ করছিলাম।

—আমাদের খবর দাওনি কেন? গল্প করতে এসেছ?

—হেঁ হেঁ! এইসাহি তো আ যাইয়েগা।

এ কী লোকের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা! কুলিদেরও তো দেখছি না! একমাত্র দিলবাহাদুর কাছে আছে। বাকিরা যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়েছে। এর আগে কখনও কুলিদের এমন ব্যবহার দেখি নি। ওরাই সব কিছু ব্যবস্থার অগ্রণী ভূমিকা নেয়। এ যে উলটো! মনে হয় এরা ট্রেকিং দলের সঙ্গে চলতে অভ্যস্ত নয়।

দল বেঁধে ঝুপড়ির লোকেরা ঘিরে ধরেছে। দেখছে। অল্পবয়সী মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। একদম বাচ্চাদের অপার কৌতূহল। একজন বৃদ্ধ—হাঁপানির রুগী, তামাক খেতে খেতে আরও বেশি করে কাশছে। তারই মধ্যে জানায়, —ঝুপড়িতে তো জায়গা হবে না। আজ পূজা ছিল, গ্রাম থেকে অনেক লোক এসেছে। অন্য কোন জায়গায় বন্দোবস্ত কর।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া যাকে বলে! এরা জায়গা না দিলে রাতে যাই কোথায়? তার উপর বৃষ্টিতে সব ভিজে সপসপে। অন্য কোথাও আস্তানাও নেই। ধনসিং নির্বিকার। হিমালয়ের পথে কেউ জায়গা থাকতেও রাস্তায় রাত কাটিয়েছে শুনি নি। এবার তাহলে কী ধারণার বদল হবে!

এগিয়ে এল দুটি যুবক—বীরেন্দ্র সিং চৌহান ও তার বন্ধু। বৃদ্ধকে বোঝায় আমাদের অসুবিধের কথা। কিন্তু বৃদ্ধ অনড়। বলে,—কহিপর ঢুন লেনে দোও। ইধার জায়গা কাঁহা?

বীরেন্দ্র সিংরা নিজেদের আস্তানায় আমাদের থাকতে বলল। ছোট্ট ঝুপড়ি। বসে কাটিয়ে দেওয়া যাবে সবাই মিলে। পোর্টারদের ব্যবস্থা অন্য কোন ঝুপড়িতে হয়ে যাবে। নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু ঝুপড়িবাসী দুই বন্ধু থাকবে কোথায়? ওদের নির্লিপ্ত উত্তর,—বৈঠ বৈঠকে রাত গুজার দেঙ্গে। বেশি ভদ্রতা দেখাতে পারি না। যদি ওদের মন

বদলে যায়? হোক ওদের অসুবিধে। এক বুক উঁচু দরজার ঝাঁপ সরিয়ে সবাই ঢুকে পড়ি। ধনসিং বেপাত্তা।

ঝুপড়ির মধ্যখানে চুলা। কাঠ যোগাড় করাই আছে। একটি তাকের উপরে সাজান। চুলা বা উনুনের পিছন দিকে একজন, দুপাশে বড় জোর তিনজন, দরজার পাশে কোনরকমে দুজন শুলেও দুজনকে বসে কাটাতেই হবে। এতগুলি লোকের মালপত্র খুলে দেখাও সম্ভব নয় কোনটা কোথায় আছে। কম্বল আনি নি। স্লিপিং ব্যাগ খোলার জায়গা নেই। বসে বসে তো আর স্লিপিং ব্যাগের ব্যবহার হয় না। ভেজা জামাকাপড় খুলতেই হয়। চাদর জড়িয়ে দরজার পাশে বসে শীতে কাঁপছি।

মনতোষ খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়েছে। ওকে এখন ক্লান্তিবোধ করলে চলবে না। কারণ কুলি-গাইডদের পাত্তা নেই। এতগুলি লোককে তো আর অভুক্ত রাখা যায় না। সেই পাটও মিটল। দিলবাহাদুরকে দিয়ে কুলিদের খাবার পাঠিয়ে দিয়ে নিজেদের ব্যবস্থা। ঘরের ছেলে দুটিও অতিথি। আনন্দ করেই খাওয়া গেল। এ ঘর ও ঘর থেকে মেয়েরাও উঁকি মেরে যাচ্ছে। ফুলের মত সুন্দর দেখতে একটি মেয়ে বীরেন্দ্র সিংদের সঙ্গে বসে গল্প করছে। বাইরে আবার বৃষ্টি। বসে বসে ঘুম তো হবে না। আমার অবস্থা দেখে মনতোষ তার দুটো কম্বল থেকে একটা আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। বেশ আরাম লাগছে এখন। আস্তে আস্তে সবাই স্বাভাবিক হচ্ছে। কিন্তু অনিল তখনও চুপ করে বসে আছে। বুঝলাম, রাগ কমেনি। সেটা লক্ষ্য করেই মণিদা বলেন, — তুমি কিন্তু সেই গল্পটা শেষ কর নি।

কোন গল্পটা বলুন তো? — অবাক হয়ে যাই।

— সেই যে…শরীর ছাড়াও নারীসঙ্গ।

মনে পড়ে যায় অসমাপ্ত গল্প বলার কথা। সবাই তখন শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব। গল্প শোনা বা বলা ছাড়া আর কীই বা করার আছে এখন!

পণ্ডিত কুমারিল ভট্টর কথামত শংকরাচার্য চললেন নর্মদাতীরে মাহিষ্মতি নগরে পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রর কাছে। কর্ম্মকাণ্ডে শ্রেষ্ঠ এই পণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত করলে আচার্য শংকরের অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠায় আর কোন বাধা থাকবে না। মণ্ডন মিশ্র রাজি হলেন। শর্ত – যিনি পরাজিত হবেন তিনি অন্যের মত গ্রহণ করবেন। বিচারক কে হবেন? বিচারক হবেন মণ্ডন মিশ্রর পত্নী সরস্বতী দেবী – কেউ বলেন উভয়-ভারতী। তিনিও ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত, সত্যনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ। আঠার দিন ধরে চলল এই তর্কযুদ্ধ।

এ গল্প পেলেন কোথায়? – মনতোষ দ্বিধায় পড়ে।

– এ তো বিখ্যাত ঘটনা। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে "শংকর বিজয়" গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

তারপর কি হল?—পরিমল অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করে।

পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্র তর্কে হেরে গেলেন। শর্ত অনুযায়ী মণ্ডন মিশ্র শংকরের শিষ্য হবেন। কিন্তু বাধা দিলেন তাঁর স্ত্রী। উভয়ভারতী বললেন, – আচার্য! বিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেবল স্বামীর পরাজয়েই কোন পক্ষের জয় নির্দ্ধারিত হয় না। পত্নীকেও হারাতে হবে। তবেই জয় সম্পূর্ণ হবে।

শংকরাচার্য রাজি হলেন। উভয়ভারতী জানতেন আচার্য শংকর ব্রহ্মচারি সন্ন্যাসী। কামশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান থাকার কথা নয়। তিনি শংকরকে কামশাস্ত্র বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। শংকর পড়লেন মহা ফাঁফরে। তাই তো, এই বিষয়ে তো তাঁর কোন জ্ঞানই নেই। তাছাড়া একজন নারীর সঙ্গে এ বিষয়ে কিভাবেই বা আলোচনা করবেন? তিনি বললেন, – আর্যে! আমাকে এক মাস সময় দিন। আমি আপনার প্রশ্নের লিখিত উত্তর দেব।

উভয়ভারতী সম্মত হলেন। কিন্তু শংকরাচার্য খুবই চিন্তিত। কামশাস্ত্রের কিছুই তো জানেন না। এই জ্ঞান লাভের জন্য কোন গৃহীর শরীরে প্রবেশ করা দরকার। চিন্তিত শংকর সশিষ্য চলেছেন বনের

মধ্য দিয়ে। হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। কি ব্যাপার! সে দেশের রাজা অমরুক রাণীসহ সসৈন্যে মৃগয়ায় এসে হঠাৎ মারা যান। তাই এই ক্রন্দনরোল। শংকরাচার্য বললেন,—ভয় নেই। রাজা কিছুদিনের জন্য বেঁচে উঠবেন।

য়্যায়সা ভি হোতা হ্যায়?—পিঠে হেলান দিয়ে বসা ফুলের মত মেয়েটি জিজ্ঞেস করে। পাশেই বীরেন্দ্র সিং। গল্প ওদেরও মনে ধরেছে। খড়ের চালায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ। উনুনে নিভু নিভু আগুনের আভা। মাঝেমধ্যে দমকা হাওয়ায় দপ করে জ্বলে উঠছে। চারপাশের চোখগুলি সজাগ। কেউ ঘুমোয়নি তাহলে!

রাণীর মনেও সন্দেহ। মৃত বেঁচে উঠবেন কি করে? তবু ভাবেন, কত অঘটনই তো ঘটে। আশায় বুক বাঁধেন।

শংকরাচার্য ফিরে গেলেন শিষ্যদের কাছে। শিষ্য পদ্মপাদকে বললেন, —আমি এক মাসের জন্য ঐ রাজার মৃতদেহে প্রবেশ করব। তোমরা আমার প্রাণহীন দেহ সাবধানে কোন নির্জন গুহায় লুকিয়ে রাখবে। দেখো, যেন কিছুতেই নষ্ট না হয়। তাহলে আর আমি ফিরতে পারব না।

শংকরাচার্যের আত্মা দেহ ছেড়ে রাজার দেহে প্রবেশ করল। রাজা বেঁচে উঠলেন। রাণী খুশি, প্রজা খুশি, অমাত্য খুশি। কিন্তু ক'দিনেই সবার মনে কেমন সন্দেহ জাগল। রাজার এ কেমন মতিগতি! আগের মত উচ্ছৃঙ্খলতা কই? রাণী তো স্পষ্টই তফাৎ বুঝতে পারেন। আগের মত চাপল্য নেই। সব কিছুতেই উদাসীন। সন্দেহ দৃঢ় হয়। নিশ্চয় কোন মহাপুরুষের আত্মা আশ্রয় গ্রহণ করেছে রাজার শরীরে। তাহলে সেই শরীর কাছেই কোথাও লুকোনো আছে। তাকে বিনষ্ট করলেই এই আত্মা আর ফিরে যেতে পারবে না। রাজা বেঁচেই থাকবেন। সুতরাং আদেশ দিলেন,—দেশের যেখানে যে কোন মৃতদেহ দেখবে, তক্ষুনি পুড়িয়ে ফেল।

রাজসৈন্য ছুটল মৃতদেহের সন্ধানে। তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। শংকর

শিষ্য পদ্মপাদ মহাচিন্তিত। আর বুঝি পারা যায়না শংকরের প্রাণহীন দেহকে রক্ষা করতে। এদিকে পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনায় শংকরাচার্য রতিশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। উভয়ভারতীর প্রশ্নের উত্তর লিখে রচনা করেন কামশাস্ত্র বিষয়ক এক গ্রন্থ। কাজ শেষ। ফিরে এলেন নিজের দেহে। উভয়ভারতীকে অর্পণ করলেন গ্রন্থখানি।

আচার্য! আপনার বিজয় সম্পুর্ণ হল।—বললেন উভয়ভারতী। প্রতিষ্ঠিত হল অদ্বৈতবাদ। মণ্ডন মিশ্র শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তিনিই দক্ষিণে রামেশ্বরধামে শৃঙ্গেরী মঠের প্রথম আচার্য সুরেশ্বরাচার্য।

সুতরাং দেহ ছাড়াও কাম হয়। কী বল অনিলদা?—পরিমলের কথায় অনিল আর রাগ করে না। হাসে।

ঝুপড়িতে বসে গল্পে গল্পে ১০৬৭১ ফুট উচ্চতায় গুলশন টপে রাত কেটে যায়। তারই মধ্যে কেউ কেউ একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। মেয়েটি একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে। অচেনা লোকেদের ঘরে একটি মেয়ে। ওরও কোন ভয় নেই, অভিভাবকেরও চিন্তা নেই। খারাপ কিছু কি এরা ভাবতেও পারে না! হোক না ছোট মেয়ে—মেয়ে তো? কই, আমরা তো সমাজে এমন নিশ্চিন্ত হতে পারি না।

দ্বিতীয় দিন। নির্মেঘ আকাশ থেকে প্রভাতের সূর্যকিরণ ঝলমল করছে গুলশন টপে। বেরিয়ে এলাম ঝুপড়ি থেকে। একপাশে বিশাল বিশাল গাছ। সামনে নেমে গেছে বুগিয়াল। আর একপাশে শুভ্র পর্বতশিখর—নন্দাদেবী, বেথারতোলি। মেঘ না থাকলেও রয়েছে কুয়াশার হালকা প্রলেপ। সূর্যদেব নিজের মত করেই উঠলেন, কিন্তু বিশেষ মহিমায় দেখা গেল না। অথচ এখান থেকে দেখা সূর্যোদয় নাকি এক মনভোলান দৃশ্য।

ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে মেয়ে, বুড়ো, শিশুর দল। কেউ গরু-মোষ দুইছে, কেউ জল আনছে, কেউ কাল রাতের বর্ষার পর খড়ের ছাউনি মেরামত করছে। আজ আমাদের গ্লাসভরা দুধ দিয়ে অভ্যর্থনা করল কালকের সেই হেঁপোরুগী বৃদ্ধ। কাল যে আমাদের প্রায়

তাড়িয়েই দিচ্ছিল সে কথা বোধহয় ভুলেই গেছে। বরফ গলে গেলে হেলং থেকে এই বক্‌রিওয়ালারা এসে ঝুপড়ি বেঁধেছে গুলশন(গোরসন) টপে। বর্ষা শেষে যখন শীত আসবে, বরফ পড়া শুরু হবে, চলে যাবে নিজের ডেরায় হেলং। এদের দেখ্‌ভাল করার দায়িত্ব বুড়ো মানুষ নিজেই নেবে—এই তো স্বাভাবিক। সুতরাং আমাদের মত উটকো লোকের ঝামেলা ঝেড়ে ফেলতে চাইবেই। আমাদের কি রাগ করলে চলে ?

পিছনের চড়াই পথে আবার বুগিয়াল। আমরা ঐ পথেই যাব। লক্ষ্য ডাকোয়ানি। কুয়ারী থেকে এক কিলোমিটার নিচে একটি গুহা আছে। ঐ পর্য্যন্ত আজ যেতেই হবে। নইলে থাকব কোথায় ? সকালের নাস্তা সেরে কিছু রুটি-তরকারি করিয়ে নেওয়া গেল। আজ প্রায় আঠার কিলোমিটার যাবার পরিকল্পনা। তাই আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছি। গুলশন টপের আশ্রয়দাতা বীরেন্দ্র সিং ও তার বন্ধু অনেকটা পথ এগিয়ে দিতে এসেছে। ওদের বিদায় জানাই। আমরা এগিয়ে যাই। ওরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই আছে।

যে কোন আশ্রয়স্থল থেকে যাত্রার শুরুতেই চড়াই। এখানেও ব্যতিক্রম নয়। প্রথম চোটেই দম ফুরিয়ে আসে। কিন্তু প্রকৃতির অকৃত্রিম রূপসজ্জা মুহূর্ত্তেই ক্লান্তি দূর করে দেয়। আউলি থেকে ঘোরসোর পথের মতই সুন্দর বুগিয়াল। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ফুলে ফুলে ঢাকা। হলুদ রঙের ফুলে ভরা। দু'হাতে গাছ সরিয়ে, পায়ে ফুল মাড়িয়ে চলেছি। তারপরই মাঠ জুড়ে নীল ও বেগুনি ফুল। সাদা ফুল। যে দিকে তাকাই শুধুই ফুল। কখনও এক এক রঙের আলাদা আলাদা অবস্থিতি ; কোথাও বা মিলেমিশে একাকার। এদেরই ভিড় এড়িয়ে একক গাম্ভীর্য্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট ফণিমনসার মত গাছ। সারা গায়ে কাঁটার আবরণ আর প্রতিটি গাঁটে কচুরিপানা ফুলের মত ছ'সাত সারি সুন্দর ফুল। ওর কৌলিন্যই আলাদা। পথ চলব, না এ সব দেখব ! মোট বইছে যে নেপালী কুলিরা, ওরা কাল থেকে চুপচাপ

আপন মনে বোঝা নিয়ে চলেছে। কারও সঙ্গে কথা বলছিল না। পয়সার জন্য মোট বওয়া, আনন্দ কিসের ? কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ওরাও ছটফট করছে, গল্প করছে, ছোটাছুটি করছে। সহজ হয়ে উঠেছে। আমাদের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব কমে যাচ্ছে। প্রকৃতি সব তুচ্ছতা ভুলিয়ে দেয়। আনন্দে সবাই ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছে।

হিমালয়ের শুভ্র বরফশিখর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ফুলেরা হাওয়ায় দুলছে। মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলে এ ফুল থেকে ও ফুলে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। কখনও তো দেখেনি, তাই দিন পনের না-কামানো দাড়িতেও এসে বসছে—ভাবছে বোধহয় 'এ আবার কী ফুল!' দেখছি। দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি। থামছি। ফুলের রাজ্যে হারিয়ে যাওয়ার এক বিচিত্র আনন্দ উপভোগ করছি। এ আনন্দ অনুভবের, বোঝাবার নয়। মন খেলে বেড়াচ্ছে মাঠে প্রান্তরে মৌমাছির গুনগুনানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফুলে ফুলে, পাহাড়ে পর্বতে, ঐ ওখানে —যেখানে গিরিশিখর মিশতে চায় নীল আকাশে।

তাড়াতাড়ি চল। এখনও অনেক পথ।—পরমানন্দ তাড়া দেয়।

—কতটা এলাম ? কোথায়ই বা এলাম ?

—বার কিলোমিটার হবে। চিত্রখানা। কেউ বলে চিত্রকান্থা।

—এখানেই থেকে গেলে হয় না ? মন যেতে চাইছেনা।

—থাকবি কোথায় ? জঙ্গলে ? ডাকোয়ানি যেতেই হবে। এখনও ছয় কিলোমিটার পথ। আবার বৃষ্টি নামলে তো কথাই নেই।

কথাটা সত্যি। তাঁবু না থাকার এই এক সমস্যা। মন চাইলেও যেখানে হোক থাকা যায় না। দুপুরের খাবার খেয়ে নেওয়া হল। কিন্তু দলের কেউ নড়ছেনা। পাহাড়ের ঢালে বুগিয়ালে ফুলের মধ্যে কেউ শুয়ে আছে, কেউ বসে আছে, কারও দৃষ্টি দূর নীলিমায় নীল হয়ে গেছে।

জলদি চলিয়ে বাবুজী!—ধনসিং সবাইকে ওঠাতে চেষ্টা করে।

—রহেনেকে লিয়ে ইধার কই ডেরা নেহি হ্যায় ?

—আধা মাইল পিছে এক গুফা ছোড়কে আয়া।

—গুহা আছে! থাকার জায়গা পাব? ফিরে চল ওখানে। আজ আর অন্য কোথাও যাব না।

পিঠে ব্যাগ তুলে নিই। দিলবাহাদুররা দ্বিরুক্তি না করে পিছিয়ে চলে। দলের সবাই যেন এই সিদ্ধান্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। পরমানন্দরই কি আপত্তি? মোটেই নয়। দলকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্যই ওর যা চিন্তা। নইলে এমন ফুলের রাজ্য ছেড়ে কে যেতে চায়? এমন দৃশ্য জীবনে আর কী দেখতে পাব?

চিত্রখানা। সার্থক নাম। প্রকৃতির বুকভরা ভালবাসার চিত্রই বটে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সবুজ পাহাড়ের ঢেউ। নানা রঙের ফুলসজ্জা। এক পাশে অরণ্য। ফুলের রাজ্য থেকে চোখ উপরে গেলেই মহামহিম হিমালয়। এ দৃশ্য কোন্ চিত্রকরের ক্যানভাসে ভেসে উঠবে জানি না, প্রকৃতির ক্যানভাসে এর রূপ তুলনাহীন।

একটি গুহা। বেশ বড়। সবারই জায়গা হয়ে যাবে। এর আগে কেউ কি এখানে ছিল? হয়তো ছিল। নাহলে ধনসিং গুহার সন্ধান জানবে কি করে? তবে বেশির ভাগই থাকে না। থাকলে আবর্জনা থাকত। গুহার মধ্যে একটুও নোংরা নেই—কালিঝুলি নেই। গুহার সামনে থেকে ফুলগাছ কেটে পরিষ্কার করতে হল। পাশেই সরু নালা। সুতরাং জলের ভাবনাও নেই। এরই মধ্যে সতের বছরের চনমনে ছেলে দিলবাহাদুর কোথা থেকে এক বোঝা ঘাস কেটে নিয়ে এসেছে। গুহার মধ্যে বিছিয়ে দেবে, যাতে এবড়োখেবড়ো ভাবটা একটু কমে। আর দুই পোর্টার কেটে নিয়ে এল কাঠ রান্নার জন্য, রাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য। জন্তু জানোয়ার এলে আগুন দেখে পালিয়ে যাবে। এসব ওদের পাহাড়ি অভিজ্ঞতা। সবাই খুশ মেজাজে আছে। কিন্তু ও কী! গুহার পিছন দিকও যে খোলা! যদি সাপখোপ আসে? যদি জোরে বৃষ্টি হয় তাহলে তো আমাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু আর ভেবেও লাভ নেই। আজ আর কোথাও যাবার উপায় নেই। যদি কিছু

হয়ই আমরা না হয় চিত্রখানার চালচিত্র হয়ে যাব।

কুছ নেহি হোগা সাব, — দিলবাহাদুর ভরসা দেয়। ওর মনে খুব ফূর্ত্তি। ছেলেমানুষ তো। মুখে মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। ইচ্ছে হয় আদর করি। কিন্তু না, তা হবার নয়। আমরা যে বাবু আর ওরা কুলি! দিলবাহাদুরের দাদা পদমবাহাদুর ওকে ধমকে দেয়, — সাহাব-লোগকা সাথ মজাক মাৎ করো। আদব শিখো।

ঢালু গুহা। শোয়া অবস্থায় একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়ছি। পিঠের নিচে পাথরের খোঁচা। সেটাতেই শরীরকে আংটার মত আটকে রাখতে হচ্ছে। ঐ অবস্থাতেই জমিয়ে গল্প চলছে। কে বলবে আমরা লোকালয়হীন দুর্গম পথের যাত্রী!

তৃতীয় দিন। ভোর হতেই চলার তাগিদ। আজই পেঁছাব কুয়ারী পাস। কাল অনেক কম পথ চলেছি। আজ তা পুষিয়ে নিতে হবে। ঠিক হল, প্রায় বাইশ কিলোমিটার গিয়ে রাত কাটাব পানা গ্রামে। কুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় কিলোমিটার চড়াই হলেও তারপর তো পুরো পথটাই উৎরাই। সুতরাং অসুবিধে হবে না।

সকাল থেকেই কুয়াশা। দূরের কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। বরফের পর্বতশিখর দেখা দিচ্ছে কিন্তু উজ্জ্বল হতে পারছে না। যেন স্বচ্ছ উড়ুনি দিয়ে ঢাকা সলাজ মুখ। আউলি-ঘোরসোর মতই বুগিয়াল আর ফুলের সমারোহ। তারই মধ্য দিয়ে উঠছি একটি অনুচ্চ পাহাড়ে। গিরিখাত ধরে একটু এগিয়েই আবার নামা। নেমেই আর একটি পাহাড়কে বেষ্টনি দিয়ে ঘুরছি। তারপর আবার চলা। এমনি করেই ওঠা-নামা করতে করতে চলা। তবে পথ তেমন বিপজ্জনক নয়। অবশ্য পথ বলতে তো কিছুই দেখি নি। একমাত্র ধনসিংই জানে কোন্ নিশানা ঠিক করে এগিয়ে যাচ্ছে। কুলিরা এ পথে তো আসেই নি, অন্য কোথাও কোন ট্রেকিংয়েও যায় নি। সুতরাং এ ক'দিন যতই বিরক্ত হই, ধনসিংকে কিছু বলার উপায় নেই। ও রাগ করে চলে গেলে আমাদের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেঘোরে মরতে হবে। পথনির্দ্দেশ কিছু নেই।

কম্পাসও নেই যে যা হোক একটা দিক ঠিক করে এগিয়ে যাব। এরই মধ্যে জেনে নিয়েছি যে ধনসিং আমাদের কাছ থেকে যে রেট নিচ্ছে তার থেকে অনেক কম দেবে কুলিদের। বাকিটা যাবে নিজের পকেটে। ধনসিংয়ের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছি। পোর্টারদের আশ্বাস দিই—ধনসিং ওদের যে টাকা দেবে ওরা তার থেকে অনেক বেশি পাবে। খুশি হয়। কাজে উৎসাহ পায়। সুযোগ পেলেই গল্প করে। গল্প করতে করতেই এগিয়ে যাই।

বাঁ পাশে তাকাতেই অপরূপ দৃশ্য! বুগিয়ালের মধ্য দিয়ে ঝুরো পাথরের পথ। দু'পাশ থেকে দীর্ঘ পাইন ও দেওদার গাছের সারি ত্রিভুজের দুই বাহুর মত গিয়ে একটি বিন্দুতে মিশেছে। দূরে নীলাভ আকাশের চালচিত্র। রোদ ও কুয়াশার লুকোচুরি খেলা। চোখ ফেরান দায়। ঐ পথটিই নেমে এসেছে তপোবন থেকে কুয়ারীর দিকে। বুগিয়ালের সীমানা ছাড়িয়ে আমরাও এসে ঐ পথেই পা দিলাম। রাস্তাটি পি. ডব্লু. ডি.র সরকারি রাস্তা। হলে কি হবে, পাহাড়ি পথের তো স্থিরতা থাকে না। কখন কোথায় ভেঙে যাবে তার ঠিক কি। তবুও ভাবলে অবাক লাগে—যে পথে বছরে কত জন লোক চলে গুনে বলা যায়, যেখানে নেই কোন বসতি, দুর্গম পাহাড়ের গা বেয়ে সেই পথও বানিয়েছে সরকার থেকে! নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। দুদিন বাদে নিশ্চিন্ত হই এই ভেবে যে এবার যখন পথ আছে তখন আর চিন্তা কি? হতভাগা ধনসিংয়ের উপর আর নির্ভর না করলেও চলবে।

দূরে পাহাড়ের গায়ে ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় কাছেই কোথাও মেষপালকদের আস্তানা। দূরে দেখা যাচ্ছে একটি গুহা। অর্থাৎ ডাকোয়ানি (১১৪০০ ফুট) পৌঁছেছি। গুহাটি মেষপালকদের দখলে। ভাগ্যিস কাল এই পর্য্যন্ত আসি নি। তাহলে আর রাত কাটাবার জায়গা পাওয়া যেত না। কাছেই কোথাও থেকে জল পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি না। চারদিক পাহাড় ঘিরে ধরেছে। দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

এই পাহাড়ের উপর উঠলেই কুয়ারী টপ।—ধনসিং জানায়।

কিতনা দূর? উঁচাই কিতনা? মালুম হ্যায়? প্রশ্ন করি।

উত্তর,—হেঁ হেঁ! ঐসাহি কুছ হোগা।

ব্যাটা কিচ্ছু জানে না। শুধু পথটুকু চিনতে ভুল করেনি, এই যা সৌভাগ্য। কিছু জানতে চাইলেই ঐ দেঁতো হাসি আর 'ঐসাহি কুছ'। হাসব না রাগব বুঝে ওঠার আগেই হাঁটা শুরু করে। পাহাড়ে উঠতে থাকে। আমরাও পিছু নিই।

উঠতে গিয়েই বাধা। জলের যে শব্দ শুনছিলাম সেটি একটি নালা। উপর থেকে নেমে আসছে। স্রোতও আছে বেশ। নেমে আসার পথে পাহাড়ের গা থেকে পাথরগুলিকে খসিয়ে ফেলে দিয়েছে। ওর বেগে আশপাশ ভেঙে গেছে। মোরেন ও বোল্ডার দুইয়েরই উপস্থিতি। বোল্ডার টপকালে মোরেনে পা হড়কাচ্ছে। সাবধানে পা ফেলতে হয়। কিছু বড় পাথর ফেলে তার উপর দিয়ে জল পার হওয়া। তারপর আবার খাড়াই পথ ধরে কুয়ারী গিরিশিরায় যাবার পথ। ডাকোয়ানি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার এমনি করে চলে পৌঁছেছি বহু আকাঙ্খিত কুয়ারী টপে (৩৬৯৯ মিটার)। কোন জয়ধ্বনি নেই। কিন্তু মনে সে কী উল্লাস! এই সেই কুয়ারী! যেখানে এসে বারবার উচ্ছ্বসিত হয়েছেন ফ্রাঙ্ক এস. স্মিথ। কুয়ারী থেকে দেখা নৈসর্গিক দৃশ্যকে পৃথিবীর সেরা পর্বত-শোভা বলতে যিনি একটুও কুণ্ঠিত হন নি! এই সেই কুয়ারী পাস যেখানে মুগ্ধ হয়েছেন হিমালয়ের প্রবাদপুরুষ শ্রদ্ধেয় শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়! আমরা আজ সেই কুয়ারী টপে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করছি। আমরা ভুলে গেছি এই ক'দিনের দুর্গম যাত্রাপথের কথা, থাকার অসুবিধের কথা, বৃষ্টিভেজা ঠাণ্ডায় ঝুপড়িতে জেগে রাত কাটাবার কথা, খাওয়ার অনিয়মের কথা। আজ আমরা বহুবর্ণিত সৌন্দর্য্যের মুগ্ধ দর্শক। ঐসব তুচ্ছ অসুবিধের কথা কী মনে থাকে?

ফুল। আবার সেই ফুল। লাল, নীল, হলুদ, সাদা নানা

রঙের ফুল উঁচু পাহাড়ের গিরিপথকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে রেখেছে। এবার বর্ষায় বিপদের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করে আমাদের আসা সার্থক হয়েছে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের নিরাপদ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন মনমাতান যৌবনের দর্শন কখনও তো পাই নি। আউলি বুগিয়াল থেকে তিন দিন ধরে চব্বিশ কিলোমিটার পথ হাঁটছি শুধু ফুলের মধ্য দিয়ে। যে দিকে চোখ গেছে, শুধুই ফুল। কই, এমন তো আর কখনও দেখি নি। শুনিও নি। হিমালয়ের সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বর্ণনা কে কবে দিতে পেরেছে? প্রতি মরশুমে, প্রতি দিনে, প্রতি ক্ষণে এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ। অনন্ত-অনাদি-অপরূপ হিমালয়। প্রতি মুহূর্তে এর নব নব সাজ। আমরা এবার তাকে দেখছি ফুল সাজে। নীল আকাশের নিচে অসংখ্য ফুলের রাজ্যে কুয়ারী গিরিপথে বসে আমরা আত্মহারা।

শুধুই কী ফুল! ঐ যে দূরে একে একে দাঁড়িয়ে আছে পর্বত শৃঙ্গগুলি—ওদের দেখার জন্যও তো ছুটে আসতে হয় বারবার। অপরূপ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে কেদার পর্বত (২২৭৭০ ফুট), নীলকণ্ঠ (২১৬৪০ ফুট), চৌখাম্বা (২৩৪২০´, ২৩১৯০´, ২২৮৮০´, ২২৪৮৫´), কামেট (২২৪৪৭ ফুট), মানাপাস (১৭৮৯০´), মানা (২৩৮৬০ ফুট), ঘোড়ি পর্বত (২২০৯০ ফুট), হাতি পর্বত (২২০৭০ ফুট), নীলগিরি (২১২৬৪ ফুট), দ্রোণগিরি (২৩১৫৬ ফুট)। আগেও এদের দেখেছি নানা জায়গায়। কিন্তু একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে এদের মিলিত রূপ—না, কল্পনাও করতে পারি নি। এ এক গিরিশিখর মহাসম্মেলন। পৃথিবীর সেরা সুন্দর দৃশ্যের এক মহামিলনক্ষেত্র। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছি গিরিরাজ হিমালয়ের ঐ তুষারচূড়ার দীর্ঘ মিছিলের দিকে।

সাব! আজ ইধারই রহে যাঁউ?—মুগ্ধ দিলবাহাদুরও এখানে থাকার আর্জি জানায়। এবার খেয়াল হয়—আমরা তো থাকতে আসি নি। আমাদের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। আমরা সাধারণ জীব। ক্ষণিকের আনন্দকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারি না। ভাল লাগাকে ভালবাসতে পারি না। ভালবেসে হারিয়ে যেতে পারি না। আমাদের

ফিরতে হবে।

এবার নামার পালা। চড়াই ভাঙার দম আটকান কষ্ট নেই। তাই সহজেই নিজেদের মধ্যে গল্প করতে পারছি। আজকেই আরও ষোল কিলোমিটার গেলে পৌঁছাব পানারাণী। সুতরাং ধনসিংকে বলে দেওয়া হল,—যেখানে জল পাবে, সেখানেই রান্নার ব্যবস্থা করবে। ধনসিং যথারীতি 'হাঁ বাবুজী' ব'লে তিন জন পোর্টারকে নিয়ে এগিয়ে যায়। দিলবাহাদুর আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না।

আর ভাবনা নেই, এবার সরকারি পথ।—মনতোষ বলে। কিন্তু হিমালয়ের পথ কে বলতে পেরেছে কখন কেমন থাকবে? কিছুটা গিয়েই দেখি ধ্বস নেমে মুছে গেছে পথরেখা। সেই ধ্বসের ঢাল বেয়ে খাড়া উৎরাই। ঝুরো মাটি। মাঝে মধ্যে পা ফেলার জন্য পাথর বেছে নিলে তা খসে পড়ছে। কখনও সোজা হয়ে, কখনও মাটি খামচে ধরে চার হাত পা এক করে নামার চেষ্টা চলছে। যারা নিচে পৌঁছে গেছে, তারা শঙ্কিত মনে তাকিয়ে আছে আমাদের নামার অপেক্ষায়। নামলাম। কিন্তু না, আবার বাঁক; যা উপর থেকে দেখা যায় নি এবং আবার একই রকম ধ্বস। প্রায় দু'হাজার ফুট এমনি খাড়াই ধ্বস বেয়ে নামতে হল। শক্ত মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছি সবাই। আগেই নামা তরুণ বন্ধুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হেসে বলি,—ভাবছিলে কেন? আমরা তো সরকারি পথেই চলেছি।

একটি প্রশস্ত নালা, নদীই বলা চলে, তীব্র বেগে বয়ে যাচ্ছে। পাড়ে ছোট-বড় অনেক পাথর। ধনসিং কুলিদের নিয়ে আরাম করে শুয়ে আছে। রান্নার আয়োজন কই! বকব কি, ভাববারও সময় নেই। মনতোষ একটুও দ্বিধা না করে কুলিদের কাঠ আনতে ব'লে রান্না করতে বসে গেল। কিছুটা সময় নষ্ট হল। হোক, বিশ্রামও তো পাওয়া গেল।

হঠাৎ গুলির শব্দ। নালার ওপাশেই ঘন অরণ্য। ঐ দিক থেকেই শব্দটা আসছে। প্রথমে কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি না।

একটু পরেই বুঝলাম। চোরা শিকারীর কাঁধে শিকার করা হরিণ। আমরা সরকারি কাজের তদারকিতে আসি নি জেনে আশ্বস্ত। রাগ হলেও কিছু করার নেই। কেই বা ওদের ধরে, কেই বা সাজা দেয়?

আবার চলার শুরু। ঘন জঙ্গলের পথ। দু'হাতে গাছ সরিয়ে পথ করে নিতে হচ্ছে। দোমরানো জঙ্গল অনুসরণ করে পেছনের দল চলেছি। জুতো-মোজা সব কাদায় মাখামাখি। তারই মধ্যে জোঁকের উৎপাত। পায়ে তো বটেই, হাতের কব্জিতে পর্য্যন্ত জোঁকে ধরছে। কি করে যে জুতো-মোজা ভেদ করে শিরা থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে কে জানে! মোজায় নুন মাখান থাকলেও মানছে না। আতঙ্কে ভুগছি। আমাদের ভয় দেখে দিলবাহাদুর আনন্দে হুল্লোড় বাঁধিয়ে দিয়েছে। ছুটে ছুটে পায়ের থেকে জোঁক টেনে টেনে ফেলে দিচ্ছে। তারপর কি যেন একটা গাছের পাতার রস পায়ে মাখিয়ে দিল। তাতে নাকি জোঁক ধরে না। তবু ধরেছে। হয়তো জীবনে প্রথম মানুষের রক্তের স্বাদ-গন্ধ—না খেয়ে পারে?

কিছুক্ষণ পরে দেখতে পাচ্ছি নিচে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা নদী। এদিক ওদিক কোন পথ নেই। নদীর ওপারে আবার মোরেনের খাড়াই ধ্বস। বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে আছে। দূরে দেখা যাচ্ছে একটি ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড। রয়েছে খড়ের ছাউনি। ঐ কি পানারাণী? কিন্তু পথ কোথায়? ধনসিংও বিভ্রান্ত। বুঝতে পারছে না কোনটা সঠিক পথ। নদীর কিনারায় নেমে এসেছি। একটা গুহা আছে জঙ্গলে ঢাকা। সাপ ও জন্তু-জানোয়ারের ভয় তো আছেই, তার সঙ্গে রয়েছে অফুরন্ত জোঁকের উৎপাত! কী করা যায়? এসে পৌঁছাল সেই চোরা শিকারী। ওরা এই গুহাতেই থাকবে। জানাল,—এই ধ্বসের চড়াই ভেঙে উঠে যাও। আরও তিন কিলোমিটার গেলে সর্তোলী। ভইসওয়ালাদের ঝুপড়ি পাবে। পানারাণী সর্তোলী থেকে সাত কিলোমিটার।

নিরুপায়। যেতেই হবে। কিন্তু ঝুরোমাটির ধ্বসের বীভৎস

চেহারা দেখে বুক কাঁপছে। চলতে চলতে একটু দাঁড়ালেই সোজা গিয়ে পড়ব জলের তোড়ে। পা রাখবার মত পাথরেরও চিহ্ন নেই। সবাই উঠছে। আমিও উঠছি। ধ্বসের চড়াই ভাঙতে যখন সত্যিই কষ্ট হচ্ছে, এগিয়ে থাকা মনতোষ পিছিয়ে এসেই হাত টেনে ধরল। গতি বাড়িয়ে দিল। ওর টানে আমাকেও দ্রুত চলতে হচ্ছে। দমে পারছি না। তবু ছাড়বে না। বলি, "ওরে আমি নিজেই পারব। ছাড়। দম বেরিয়ে যাবে যে!" কে কার কথা শোনে? পার হলাম। শক্ত মাটি। সবুজ বুগিয়াল। গাছের ছায়া। এবার মনতোষ হেসে বলে, "যতক্ষণ খুশি, বসুন।" তখনও বুকের ধড়ফড়ানি কমে নি। হাঁফাতে হাঁফাতেই বলি, "মেরে ফেলে আরাম করতে বলছ?"

কিন্তু আরাম কপালে নেই। সন্ধ্যে নেমে আসছে। আকাশে মেঘ। যে কোন সময় বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। দু'পাশে ঘন অরণ্য। ছোট ছোট সাপও দেখছি। রাস্তার উপরই কিলবিল করছে। প্রতি-নিয়ত পায়ের থেকে জোঁক ফেলতে হচ্ছে। চলার গতি না বাড়িয়ে উপায় নেই। ধনসিং কুলিদের নিয়ে আগেই চলে গেছে। তরুণ বন্ধুর দলও এগিয়ে গেছে। ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হল। একটি মাত্র টর্চ রয়েছে আমাদের পিছিয়ে পড়া দলের সঙ্গে। তারই আলোতে পথ দেখে চলা।

পেঁ ৗছেছি সর্তোলী। ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড। ভইসওয়ালাদের ঝুপড়ি। পরমানন্দর গলা শোনা যায়, "উপরে উঠে আয়।" দিলবাহাদুর এসে পিঠের ঝোলা নিয়ে যায়। ঢুকলাম এক ঝুপড়িতে। এক বৃদ্ধা তার ঘরটা ছেড়ে দিয়েছে। ঘরের এক পাশে গরু-মোষ। এক পাশে চুল্লি। আগুন জ্বালিয়ে তারই চারদিক ঘিরে আমরা বসে আছি। বৃদ্ধা দু'ঘটি দুধ আর মাঠা দিয়ে গেল। রান্নাও চেপে গেল।

পরিমল আর অনিলকে দেখছি না। ওরা কোথায়?—জানতে চাই।

ওরা নিচের এক ঝুপড়িতে উঠেছে।—সলিল জানায়।

ওদের ডেকে আন তো।—পরমানন্দ নির্দ্দেশ দেয়।

ওরা আসে। কিন্তু পরিমলের হাসি থামে না। বিস্মিত মণিদার প্রশ্ন,—হাসছ কেন?

—হাসব না! অনিলদার হিন্দি শুনুন। কী বলেছে ওখানে! ঐ ঘরে শুধু মা আর মেয়ে আছে। বেশ যত্ন করে আমাদের মাঠা খাওয়াল। আগুনে জামা-কাপড় শুকোচ্ছি। বেশ আরামই লাগছে। হঠাৎ অনিলদা ওদের বলল, "হাম ইধার তুমারা সাথ শোয়েগা। সমঝা?" শুনেই মা-মেয়ের মুখ লাল।

আমরাও হেসে ফেলি। বিব্রত অনিল কারণ বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে বলে,—কী এমন বলেছি! এখানে এতগুলো লোকের জায়গা হবেনা, তাই বললুম ওদের ওখানে শোব।

কিন্তু হাসি আমাদের বেশিক্ষণ থাকে না। বৃদ্ধা যে জল এনেছে তা ব্যবহার করা যাবে না—জানায় ধনসিং। কারণ? বৃদ্ধা হরিজন। ছোটি জাত। তুমি বাবা কী বড় জাতের কাজ করেছ? এর ছেড়ে দেওয়া ঘরে আশ্রয় নিতে তো বাধেনি? ওর দেওয়া দুধ-মাঠা খেয়েছ মৌজ করে। ওর তোলা জলেই যত আপত্তি! বৃদ্ধাও কুণ্ঠিতা। জল তোলার সব ব্যবস্থা করে দেয়, কিন্তু নিজের হাতে দেবে না। বড়দের কি জাত মারতে আছে? পাপ হবে যে। আমরা ঠিকমত আগুন জ্বালাতে পারছি না—বুড়ি দেখিয়ে দেয়। আটা কতটা নিতে হবে, কি করে মাখতে হবে, রুটি কি করে বানাতে হবে—বুড়ি বৃষ্টিতে ভিজে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দেয়। ছেলেদের অনাড়িপনা দেখে মা ব্যাকুল, তবু তাঁকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। উনি হরিজন। মাও অস্পৃশ্যা! ধিক আমাদের জাত্যাভিমান।

সন্ন্যাসীরা জাতিভেদ মানেন? শংকরাচার্য মানতেন?—মণিদার বেদনার্ত্ত গলার স্বর শোনা যায়। আর সবার মুখ থমথমে।

মানতেন। আবার মানেনও নি।

—সে কীরকম!

যোগসূত্রের রচয়িতা মহর্ষি পতঞ্জলি, যিনি গোবিন্দপাদ নামে

বিখ্যাত -- নর্মদাতীরে শংকরাচার্যকে নানাবিধ সাধন প্রণালী শিক্ষা দিয়ে নির্দ্দেশ দিলেন, "জগতে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম এবং অদ্বৈত তত্ত্ব প্রচারে আত্মনিয়োগ কর। ব্যাস সূত্রের ভাষ্য রচনা কর।" সেইমত শংকরাচার্য এলেন কাশীধামে। চারদিকে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি। একদিন তিনি স্নান করতে চলেছেন মণিকর্ণিকার ঘাটে। এমন সময় দেখেন, একদল কুকুর নিয়ে এক চণ্ডাল পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। শংকর দ্বিধা করেন। পুণ্যস্নানে চণ্ডালের ছোঁয়া লাগবে ? কী করেন ?

চণ্ডাল শংকরাচার্যকে জিজ্ঞেস করে, — সন্ন্যাসী ! গঙ্গাজলে আর চণ্ডালের বাড়ির পুকুরের জলে চাঁদের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তা কি ভিন্ন ? তাহলে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে ভেদ কেন ?

চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শংকরাচার্যের মন থেকে জাতিভেদের দ্বন্দ্ব দূর হল। তাই বলতে পারলেন, "সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম" — সবই ব্রহ্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত ভারতবাসীকে — চণ্ডাল ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী সবাইকে ভাই বললেন। তবু জাতবিচারের অভিশাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারলাম কই !

চতুর্থ দিন। ভোর হতেই চলার প্রস্তুতি। বেরিয়ে এলাম ঝুপড়ি থেকে। বেশ বড় ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড। তিন দিকে গভীর বন। বুগিয়ালের এখানে ওখানে দূরত্ব রেখে অনেকগুলি ঝুপড়ি। ব্যারাকের মত একটানা নয়। কারণ ? সেই জাতপাত। এক শ্রেণীর আর এক শ্রেণীর সঙ্গে প্রভেদ। অথচ কাজ একই। চারণভূমিতে গরু-মোষ চরাবে। ঘি-মাখন তৈরী করবে। শীত পড়তে ফিরে গিয়ে শহরে বিক্রী করবে। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকবে। এখানেও যখনই প্রয়োজন হবে, একসঙ্গে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু নিজেরা এক কিছুতেই হবে না। সকালেই বৃদ্ধা ঘটি ভরে নিয়ে এল মাঠা অর্থাৎ ঘোল। তারপর আমাদের ছাতু দিয়ে নাস্তার সময় নিয়ে এল দুধ। পয়সা নেবার প্রশ্নই ওঠে না। ধনসিং তাড়া দেয়, — আউর লে আও।

ওর হাতে জল না খেতে পারুক — বেশি করে দুধ খেতে আপত্তি নেই।

কুলিদের বলে দেওয়া হয়েছে যাতে বেশি করে রুটি বানিয়ে নেয়। দুপুরে আর রাঁধতে হবে না। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আমরা চলার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কুলিদের এত দেরি হচ্ছে কেন! গিয়ে দেখা গেল — ওরা পেটপুরে রুটি খাচ্ছে। যা বানাতে বলেছি, এখানেই প্রায় শেষ। অদ্ভুত দলের পাল্লায় পড়েছি তো! হঠাৎ বুড়ি আমাদের তাড়া দেয়, — জলদি ঘর ছোড়ো। নিকাল যাও। আভি চলা যাও।

হকচকিয়ে যাই। এত কিছু করার পর এমন ব্যবহার কেন! বুড়ির চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া। কেন? কিছু বুঝতে পারি না। ঘর ছেড়ে দিই। তাতেও বৃদ্ধা সন্তুষ্ট নয়। এক্ষুনি এই সর্তোলী থেকেই চলে যেতে হবে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, বহু দূরে সেই চোরা শিকারী। ওদের দেখেই বুড়ির আতঙ্ক। হয়তো ওরাই এখানকার সর্দার। আমাদের মত লোকদের জায়গা দিয়েছে শুনে বুড়ির উপর অত্যাচার করবে। অন্য কিছুও হতে পারে। বৃদ্ধাকে বিব্রত করে লাভ নেই। এক রাতের মুসাফির আমরা কোন কিছুরই বদল ঘটাতে পারব না। রুখে দাঁড়িয়ে লাভ কি? হাঁটা শুরু করি।

কাল সর্তোলীতে উঠতে সামনের ঢাল বেয়ে চড়াই ভেঙেছি। আজ পিছনের উৎরাই পথ ধরে চলা। এখান থেকে মাত্র সাত কিলোমিটার দূরে গ্রাম পানারাণী (২৪৬৫ মিটার)। কাল আমাদের এখানেই আসার কথা ছিল। হয় নি। আগেই সার্ত্তালীতে থেকে গেছি। ডান দিকে পানাগ্রাম ছেড়ে বাঁয়ের সরকারি রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। যাব ঝিঝি। পানা থেকে তের কিলোমিটার। মোট বিশ কিলোমিটার হলেও অসুবিধে হচ্ছে না। একে উৎরাইর পথ, তার উপর রাস্তাও ভাল। গাছ গাছালির মধ্য দিয়ে দূরের পাহাড় দেখতে দেখতে এগিয়ে যাওয়া। পথের দুর্ভাবনা মাথায় নেই। দূরে হলেও লোকালয় আছে। দেখা যাচ্ছে ছবির মত একটা সুন্দর পাহাড়ি গ্রাম ইরানী। লাল রঙের চালার ঘরগুলি সৌন্দর্য্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ওখানে স্কুল আছে,

ডাকঘর আছে। উঠোনে তরিতরকারির সতেজ গাছগুলি মনকে লোভাতুর করছে। ক'দিন এসবের স্বাদ যে পাইনি।

দিল!—একটু এগিয়ে থাকা দিলবাহাদুরকে ডাকি। ও আসে। বলি,—তুমি যাবে আমার সঙ্গে কোলকাতায়?

—জী সাব! যাব। কুছ নোকরি দেবে?

—চাকরি! এখন তো বলতে পারছি না। তবে আমার কাছে থাকবে, খাবে। কিছু টাকাও পাবে। লেখাপড়া করবে। পরে কোথাও সুযোগ পেলে চাকরি করবে।

কেইসা নোকরি? দারোয়ানী আউর খানা পাকানেকা?—পদম বাহাদুর বলে,—আর কিছু চাকরি তো তোমরা নেপালীদের দাও না। চাকর বানাবার জন্য দিলবাহাদুরকে নেবে?

থমকে যাই। তাই তো। অতি সাধারণ সত্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি যে দিলবাহাদুরকে নিতে চাইছি, তার পিছনে এমনই কি গোপন ইচ্ছা ছিল না? হয়তো ওকে ভালবেসেছি। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে গেলে আমি ওকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাতে কী করতে পারব? কোনও সম্মানজনক চাকরি তো ওকে দেবার সামর্থ্য আমার নেই। সাধারণ কুলি পদম বাহাদুরের কথাতে এও বুঝি—কী করে ধীরে ধীরে নেপালীদের মনে ভারতীয়দের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা গড়ে উঠছে। ওরা যে এখানে যথেষ্ট সম্মানজনক কাজ পায়না, বঞ্চিত হচ্ছে, এমন মনোভাবই ক্রমশঃ ওদের মনে দানা বাঁধছে। দার্জিলিঙের আন্দোলনের পটভূমিতে ওদের অনুভূতি বুঝতে চেষ্টা করি। কোন উত্তর দিতে পারি না। দিলবাহাদুরকেও আর কিছু বলতে পারি না। এগিয়ে যাই।

এখন দুপুর। দূরে পাহাড়ের উপর দেখা যাচ্ছে ঝিঝি গ্রাম। ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে। কিন্তু উচ্চতা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এবার চড়াই ভাঙতে দম বেরুবে। এতক্ষণ প্রায় সমস্ত পথটাই নেমেছি। এবার উঠে সমতা না আনলে চলবে কেন? সামনেই বড় নালা। ছোট্ট

নদীর সংস্করণ। একটু বিশ্রামের জন্য সবাই বসি। একদল স্থানীয় লোক রামনী থেকে খচ্চরের পিঠে স্লেট পাথর চাপিয়ে ইরানী গ্রামে নিয়ে যাচ্ছে। আলাপ করি। পথের খবর নিই। ওদের কাছে এই চড়াই উৎরাই কোন ব্যাপার নয়। উৎসাহ দেয়। জানতে চায় আমাদের দেশের কথা। কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারে না। খচ্চর মাল নিয়ে এগিয়ে গেছে। ওরাও এগিয়ে যায়। আমরাও এগুই।

ঝিঝি। ছোট্ট গ্রাম। সুন্দর পরিবেশ। চমৎকার আবহাওয়া। গৃহস্থবাড়িতে সব্‌জির বাগান। এখানে ওখানে আখরোট গাছ। আখরোট এখন একদম কাঁচা। চাপ দিলে দুধের মত রস বেরুচ্ছে। রাস্তায় ট্যাপ ওয়াটার। আশ্রয় পেলাম এক সম্পন্ন গৃহস্থবাড়িতে। সুন্দর নিকোনো প্রশস্ত উঠোন। মাটি ও পাথরের মিশ্রণে বানানো পরিচ্ছন্ন ঘর। তিন পাশে বাগিচা। ফুল-সব্‌জির বাগান। গৃহকর্তা ভজন সিং একমুখ হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। বাগান থেকে তুলে দিলেন আলু, মরশুমের প্রথম বাঁধাকপি, কুমড়ো। যোগান দিলেন রান্নার সরঞ্জাম। ছেড়ে দিলেন একটি সুসজ্জিত ঘর। সর্ব্বত্র একটি সূক্ষ্ম রুচির ছাপ। ভদ্রমহিলা এসে হাতে পরিয়ে দিলেন রাখী। কয়েক মিনিটেই আমরা যেন নিজেদের পরিচিত ঘর খুঁজে পেলাম।

পরমানন্দর আনন্দ দেখে কে! হৈ হৈ করে নিজেই রাঁধতে চলে গেল। ক'দিন বাদে আজ যুৎ করে খাওয়া হবে। রান্না শেষ। এখনও সন্ধ্যে হয় নি। মনে পথ চলার দুর্ভাবনা নেই। পাহাড়ের মধ্যে নিবিড় বন ও শস্যক্ষেত। জমিয়ে গল্প চলছে।

খানা নেহি খাইয়েগা বাবুজী?—কুলিরা জানতে চায়।

বাদমে।—পরমানন্দ সিদ্ধান্ত জানায়।

ওরা চলে যায়। পরমানন্দকে বলি,—খেয়ে নিলেই হতো। সর্তোলীতে যেমন রুটি খেয়েছে, তেমনি সব খেয়ে নেবে নাতো?

খেলেই হল? আমি রেঁধেছি। আমরা না খেতে ওরা খাবে? —পরমানন্দ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। আমাদের আশ্বস্ত করে,—খেলে

এমন বকব, দেখিস।

সেই বিশ্বাস নিয়েই থাকি। মোমের আলোয় বেশি রাত করার কোন মানে হয় না। কিছুক্ষণ বাদেই খেতে যাই। কুলিদের শোবার আয়োজন চলছে। জিজ্ঞেস করি,—ধনসিং! তুমলোগ খানা নেহি খায়গা?

ধনসিং হেঁ হেঁ করে হেসে বলে,—হামলোগ খানা খা লিয়া।

সবাই পরমানন্দর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলি। ওর এত সাধ করে রান্না তরকারি প্রায় কিচ্ছু নেই। হতাশ চোখে বিব্রত পরমানন্দ বলে—হতভাগাদের কাণ্ড দেখেছিস! কি বলি বল তো? এমন গাইড বাপের জন্মে দেখি নি।

পঞ্চম দিন। সুন্দর সকাল। ভজন সিংজীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। ওঁর আতিথ্যর বিনিময়ে আমরা কিছুই দিতে পারছি না। না নেবেন সব্‌জির দাম, না নেবেন ঘর ভাড়া। বলতেও পারি না। ভদ্রমহিলাকে ডেকে একটা নোট ওঁর হাতে দিয়ে নমস্কার জানাই। অপ্রস্তুত হন। কিভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন ভাবার আগেই বলি,—আমাদের রাখী পরিয়েছেন। আমরা তো ভাই। ভাই দিদিকে মিঠাই খাওয়াতে পারবে না?

চুপ করে যান। চোখ ছলছল করে। স্নেহ-মমতার বন্ধন পিছনে পড়ে থাকে। আমরা এগিয়ে চলি।

ঝিঝি থেকে রামনী গ্রাম এগার কিলোমিটার। আজ ওখানেই যাব। ভজন সিংজীর কাছে জেনে নিয়েছি, ছয়-সাত কিলোমিটার চড়াই। রামনী বড় গাঁও। বাংলোও আছে। সুতরাং ভাবনা নেই। স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কিত প্রশ্ন করেছি,—লেকিন জোঁক? হেসে উত্তর দিয়েছেন,—য্যাদা নেহি। অর্থাৎ আছে। দুর্ভাবনা যায় না। আমার চিন্তা দেখে দিলবাহাদুর বলে,—ঘাবড়াইয়ে মাৎ সাব! আমি তো সঙ্গে আছি। ছাড়িয়ে দেব।

—ছাড়াবি তো। কিন্তু জোঁকে ধরা ঠেকাবি কি করে?

—সব ঠিক হো যায়গা সাব!

বলে আর হাসে। অর্থাৎ আমাকে জোঁকে ধরলেই যেন ওর কাছে বেশি মজা হবে। ছেলেমানুষ। অল্পতেই মজা পায়। কিন্তু দলের আর সবাইও যে হাসছে! হাসুক। আমার মত এতগুলি জোঁকে তো ওদের ধরে নি।

চড়াই শুরু। দু'পাশ থেকে গাছগাছালি আকাশ ছুঁতে চাইছে। পাথর বিছানো পথ। ঘোড়া চলাচলে ময়লার ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ। পাথরের ফাঁক ও পাথরের উপর থেকেও জোঁকেরা পায়ে উঠবার চেষ্টা করছে। উঠতে উঠতে হাঁফ ধরে যাচ্ছে। তবু চলছিই। পথ যেন শেষ হয় না। অবশেষে চড়াই শেষ হল। বন থেকে বড় বড় গাছ কাটা চলছে। কাটা গাছের থেকে একটা গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে। হুড়মুড় করে বিশাল গাছটি উপড়ে পড়ছে। কে শুনবে তার আর্তনাদ? অরণ্যজননীর বুকের পাঁজর ভেঙে রক্ত-কুঠার হাতে কাঠুরে মানুষের সে কী উল্লাস! আবার এরাই বলবে,—হে অরণ্য! তোমায় আমরা ভালবাসি।

দূরে দেখা যাচ্ছে রামনী গ্রাম। আকাশে আবার মেঘ। সামনেই ঝোরা থেকে জল নেমে আসছে। অনিলকে মনে করিয়ে দিই, "সামনেই লোকালয়। প্রকৃতির মধ্যেই প্রাকৃতিক কাজটা সেরে নিলে হতো না?" অনিলের তাৎক্ষণিক উত্তর, "দাদা, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? শুনলে, ওখানে বাংলো আছে। বেশ নিশ্চিন্তে ও সব করা যাবে।" প্রতিবাদ করিনা। একদিক থেকে ও সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে, যেখানে প্রথম সুযোগ পাবে, সেটাকে অবহেলা করো না। পরেরটা অনিশ্চিত।

পৌঁছলাম রামনী। পাহাড়ের গায়ে ২৪৯৯ মিটার উচ্চতায় সুন্দর গ্রাম। গ্রামে পৌঁছবার আগেই পেয়ে গেলাম বাংলো। আমার আগেই সবাই পৌঁছে গেছে। লনে বসে আছে। হাসছে। অনিল গম্ভীর।

পৌঁছেই জিজ্ঞেস করি, —তোরা সব বাইরে কেন ?

মণিদা হেসে বলেন, —অনিলকেই জিজ্ঞেস কর।

কিছু জিজ্ঞেস না করেই ঘরের দিকে যাই। না হেসে উপায় আছে ? দরজা-জানালা কিচ্ছু নেই। পোড়ো হয়ে আছে। ভাঙা দেয়াল। জায়গায় জায়গায় কালিঝুলি। মেঝে ভর্তি ঘোড়ার মল-মূত্র। রাতে ঘোড়ার আস্তানা। অবস্থা দেখে অনিলের দিকে তাকাই। ওর করুণ স্বর, —কি করে জানব ? তোমরা যে বললে, বাংলো আছে।

হাতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে শিস দিতে দিতে এসে ধনসিং জানাল, —থাকার জন্য গ্রামে জায়গা পাওয়া গেল না।

মনতোষ আমার দিকে তাকায়। ঘাড় কাৎ করি। কেউ কিছু বুঝবার আগেই মনতোষ বেরিয়ে যায়। মিনিট পনের পরে এসে জানায়, —চলুন। স্কুল ঘরে থাকতে দেবে। কিন্তু ভোরেই ঘর ছেড়ে দিতে হবে। ওদের সকালে স্কুল।

বাবা ধনসিং! জায়গা নাকি পাওয়া যাবে না ?—সলিল প্রশ্ন করে।

ধনসিংয়ের ঝটতি উত্তর, —ইংলিশ শুনে জায়গা দিয়েছে। ওরা তো ইংলিশ জানে না।

স্কুল ঘরে পৌঁছতেই শুরু হল বৃষ্টি। স্লেটপাথরের চালা থেকে জায়গায় জায়গায় জল পড়ছে। তারই মধ্যে কোণা খুঁজে রাত কাটাতে হবে কোনরকমে। স্কুল প্রাঙ্গণে ফুলের গাছ। আপেল গাছের ডালে ডালে আপেল। ছোট ছোট বাচ্চারা ছিঁড়ে নষ্ট করে না। ভাবা যায়!

বেশ বড় গ্রাম রামনী। বাড়িও অনেক। বেশির ভাগই গায়ে গায়ে লাগান। ঝুম চাষের ব্যবস্থা। রামদানা, আলুর চাষ হয়। প্রয়োজনীয় শাক-সব্‌জিও রয়েছে। সব বাড়ির আঙ্গিনাতেই ফুলের গাছ। মরশুমে আপেলও হয় প্রচুর। পাওয়া যায় স্লেটপাথর। তাই ভেঙে খচ্চরের

পিঠে নিয়ে চালান যায় দূর দূর গ্রামে। অন্য পাহাড়ি গ্রামের মত লালার দোকানও আছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায়। শান্ত পরিবেশে বেশ লাগছে থাকতে। গ্রামের এক পাশ দিয়ে নালা বয়ে যাচ্ছে। ওখানেই প্রাতঃকৃত্য। নারী-পুরুষ ভেদ নেই। কেউ কিছু বোধহয় মনেও করে না। আমাদেরই হয়েছে মুশকিল। অভ্যেস নেই তো। সারা রাত ধরে বৃষ্টি পড়ছেই। গ্রামের এক কোণায় স্কুল ঘরে আমরা ক'জন। অবিরাম বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

ষষ্ঠ দিন। সকালেও বৃষ্টি হচ্ছে। ভাবনার কথা। কিন্তু যেতে আমাদের হবেই। দশ কিলোমিটার তো পথ। তারপরই পৌঁছাব ঘাট। শেষ হবে এ বছরের ট্রেকিং। এবার ঘরে ফেরার তাগিদ। আমরা লোকালয়ের মানুষ। ক'দিন জনহীন পাহাড়-পর্বতে, পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি দেখার নেশায়। আজ তার সমাপ্তি পর্যায়ে খোঁজ পড়ছে বাড়ি-ঘরের। ঘাট পৌঁছালেই পাব দোকানপাট, বাস রাস্তা, হোটেল, বাংলো, লোকালয়। শিশু পড়ুয়ারা স্কুলে আসতে শুরু করেছে। বর্ষাতি চাপিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই শুরু হল চলা।

রামনী গ্রাম থেকে বেরিয়েই নালা পার হয়ে চড়াই। পাহাড়ের গিরিশিরা ধরে এগিয়ে যাওয়া। তারপরই উৎরাই। পথ আছে। দু'পাশে নয়নভোলান সৌন্দর্য্য। দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে চাষজমি, বাড়িঘর, পাইন গাছের সারি। কোনও কোনও বাঁক থেকে দেখা যাচ্ছে পর্বতশিখর। মনে পড়ছে রূপকুণ্ড দেখে সুতোল-কণোলের পথ ধরে ঘাটে আসার সময় দেখা অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা। যা দেখে বন্ধু বলেছিল,—এমন শোভা কাশ্মীরেও দেখিনি। ও অনেক জায়গায় বহু কিছু দেখেছে। ওকে অবিশ্বাস করি নি। সেই পথ বাঁ দিকে চলে গেছে। এই পথেও তেমনি পাইন-দেওদার গাছের সারি। গ্রামের মেয়েরা ঘাসের বোঝা পিঠে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই সব দেখতে দেখতে, গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছি। আউলি থেকে কুয়ারী

পর্য্যন্ত অফুরন্ত ফুলের উপর দিয়ে হাঁটার স্মৃতি, চিত্রখানায় গুহায় থাকার স্মৃতি, মেষপালক ও ভঁইসওয়ালাদের ঝুপড়িতে থাকার স্মৃতি, ঝিঝির আতিথ্য—সব একে একে মনের পর্দ্দায় ছায়াছবির মত ভেসে উঠছে। এ সব ছেড়ে এবার ফিরতে হবে! ভাবতেই মন ভারি হয়ে উঠছে।

মন ভারি দিলবাহাদুরেরও। কুলির দল প্রায় চুপচাপ পথ চলছে। আজ আর এগিয়ে যাচ্ছে না। এ ক'দিনের যাত্রাপথে ওদের ভালবেসে ফেলেছি। ওরাও কি তেমনি ভালবেসেছে? না হলে পদম বাহাদুর বলে কেন,—সাব! মুক্তিনাথ গেলে আমাদের চিঠি দিও। আমাদের গ্রাম দেখাব। তোমাদের সঙ্গে যাব।

বোকার দল। জানে না, পথের ভালবাসা অন্তরে থেকে যায়। ব্যবহারিক জগতে তার স্থান নেই। কোনদিন হয়তো তোমাদের চিঠিও লিখব না। কিন্তু তোমরা থাকবে প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে। সময় পেলেই গুলশন টপ-চিত্রখানা-কুয়ারীর ফুলের মত তোমাদের মুখগুলি হেসে উঠবে। কেউ দেখবে না। তোমরাও নয়। দেখব শুধু আমি। একে কি ভালবাসা বলে?

শংকরাচার্য কি এমনি করেই প্রকৃতিকে ভালবেসেছিলেন? তিনি মাত্র বত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন। কর্ম্ম-ময় জীবন কাটিয়ে আবার এসেছেন হিমালয়ে। গিয়েছেন কৈলাসে। প্রকৃতিকে—হিমালয়কে ভাল না বাসলে কি অত কষ্ট করতেন? হয়তো এ পথেই গেছেন। এমনি করেই উপভোগ করেছেন নৈসর্গিক দৃশ্য। আমরা যেমন করছি। পরিব্রাজন তো সাধনারই অঙ্গ। প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষি, রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র, মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব, গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ—কে পরিব্রাজক নন? ভ্রমণের মধ্য দিয়ে তাঁরা জেনেছেন দেশকে, দেশবাসীকে, প্রকৃতি ও পরিবেশকে। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁরা সংস্কার করেছেন ধর্ম্মের, সমাজের, রাজনীতির। তাঁরা কালোত্তীর্ণ পুরুষ হয়েছেন। মহাপুরুষ হয়েছেন। ভ্রমণ তাঁদের

অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যাই।

সামনেই দেখা যাচ্ছে ঘাট। পাহাড় ভেঙে পথ চওড়া করা হচ্ছে। ছুটি পুল পার হয়েই পেঁৗছলাম ঘাট। নন্দাকিনী নদীর তীরে একটি গঞ্জ। দূর দূরান্ত থেকে গ্রামবাসীরা ঘোড়ার পিঠে, বক্‌রির পিঠে, ভেড়ার পিঠে চাপিয়ে বয়ে নিয়ে আসে তাদের ফসল—বেশির ভাগই আলু, মরসুমে আপেল। আড়ৎদাররা কিনে নেয়। ন্যায্য দাম পায় না। কিন্তু নিরুপায়। আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ঠকেও বেচতেই হয়। যা পয়সা পায়, তারই বিনিময়ে কিনে নিয়ে যায় তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

এতদিন ভাবনা ছিল না। লোকালয় মানেই তো হিসেবনিকেশের পালা। আরাম আয়োজনের ব্যবস্থা। তাই করতে হচ্ছে। হোটেলে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলো। ধনসিংয়ের পাত্তা নেই। এখানে পৌঁছেই চলে গেছে ওর এক আত্মীয় বাড়ি। বাস ছাড়ার আগে আসবে হিসেব বুঝে নিতে। এল। মনে খুশি খুশি ভাব। এই ক'দিন শুধু পথ দেখান ছাড়া কুয়ারীর পথে গাইডের কোন দায়িত্বই পালন করে নি। আমরাই রেঁধে খাইয়েছি। আমাদের খাবার আগেই খেয়ে নিয়েছে। এসব কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কুলিদের ন্যায্য পয়সাও মেরে দেবে—এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছি না। ঠিকাদারের কাজ করত। লোক ঠকাবার অভ্যেস পালটাতে পারে নি।

পরমানন্দ ধনসিংকে ওর আত্মীয়র সামনেই হিসেবের টাকা সাব্যস্ত করে—ওর কত, কুলিদের কত। টাকা বের করে। মুহূর্তে পরমানন্দর হাত থেকে মনতোষ টাকা নিয়ে নেয়! ধনসিংকে ওর প্রাপ্য টাকা দেয়। কুলিদের হাতে দেয় কুলিদের টাকা। দিলবাহাদুররা ভাবতেও পারে নি ওরা এত বেশি টাকা পাবে। অবাক হয়ে যায়। ধনসিং একবার প্রতিবাদ করতে যায়। মনতোষ বলে,—তোমার টাকা ঠিক পেয়েছ তো? ব্যাস।

কাউকেই কম দেওয়া হয় নি। সুতরাং কিছু বলার নেই। ধনসিং আত্মীয়র সামনে বলতেও পারে না যে কুলিদের ঠকিয়ে আমাদের থেকে বেশি নিচ্ছিল। একদম বোকা ব'নে দাঁড়িয়ে থাকে।

নন্দপ্রয়াগ যাবার বাস এসে গেছে। দিলবাহাদুরদের সঙ্গে নিয়েই বাসে উঠি। ওরা জানে, ওদের দায়িত্ব শেষ। দূরে পিছনের সিটে বসে। ওদের বাস ভাড়াও আমরা দিই। ডেকে কাছে বসাই। জিজ্ঞেস করি,—কেয়া দিল! খুশ হো তো?

দিলবাহাদুররা কোন কথা বলতে পারে না। চোখের কোণে জল চিকচিক করে। কুয়ারীর ব্লু-পপির পাপড়িতেও দেখেছি এমনই শিশির বিন্দু টলটল করছে।

—আউলি-চিত্রখানা-গুলশন টপ-কুয়ারীর যাত্রাপথ